শিকার-কাহিনী।

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য
প্রণীত।

সান্যাল এণ্ড কোং।

কলিকাতা

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্ ভারত-মিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৩।

ভূমিকা।

জীবনে শিকার যথেষ্ট করিয়াছি, আরও করিব আশা করি। যতদিন দেহে বল ও শিরায় দৃঢ়তা থাকিবে, ততদিন শিকার একেবারে ত্যাগ করিতে পারিব, বোধ হয় না। শিকার ব্যসন—নির্দ্দোষ আমোদ এবং পৌরুষ ক্রীড়ার মধ্যে পরিগণিত। কবি কালিদাস বলেন ;—

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ।"

শকুন্তলা।

"শিকার-কাহিনী" লিখিয়া গ্রন্থ করিব, জনসমাজে পরিচিত হইব, মনে এইরূপ সংকল্প পূর্ব্বে ছিল না। থাকিলে তদুপোযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম, গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিত না, অধিকতর সুন্দরই হইত। এই যে এখন অতীত স্মৃতির আশ্রয়ে বিড়ম্বিত হইতেছি; ইহা আজ ভোগ করিতে হইত না। স্মৃতির সাহায্য না লইয়াই গ্রন্থ শেষ করিতে পারিতাম। যাহা হউক, সে জন্য এখন পরিতাপ বৃথা।

আজ কতিপয় বৎসর হয়, আমার কয়েক জন বন্ধুর অনুরোধে এবং উৎসাহে শিকার কাহিনী লিখিতে ইচ্ছা করি। সেই শুভ মুহূর্ত্তে "নির্ম্মাল্য" সম্পাদক—শ্রীমান্ রাজেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া তাঁহার নির্ম্মাল্য পত্রিকায় "আমার শিকার-কাহিনী" নাম দিয়া ক্রমান্বয়ে গুটিকত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ এবং শিক্ষিত সুহৃদ মণ্ডলীর নিকট উক্ত প্রবন্ধগুলি একেবারে অনাদৃত না হওয়ায়, বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলাম। সেই উৎসাহ ও উদ্যমের ফলে, এবং বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে "শিকার-কাহিনী"র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

এই খণ্ডে মাত্র আমার শিক্ষা-নবিশীর অবস্থাই বর্ণিত হইল। ইহাতে শিকারের অলৌকিকত্ব কিছুই দেখাইতে পারিলাম না। পাঠকগণের উৎসাহ পাইলে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমিই বোধ করি, বাঙ্গালায়—এ পথের প্রথম পথিক। এই নূতন পথে চলিতে, অর্থাৎ বঙ্গভাষায় "শিকার-কাহিনী" লিখিতে যাইয়া, বিপথগামী হইয়াছি কি না, পবিত্র মাতৃ-ভাষার কোমল অঙ্গে কোনরূপে কালিমা সঞ্চার করিয়াছি কি না, সে জন্য আমি বড়ই শঙ্কিত। কারণ, এই নূতন পথে চলিতে, স্থানে স্থানে আমাকে শিকার উপযোগী ভাষা গঠন করিয়া লইতে হইয়াছে; তাহাতে কতটা সফলকাম হইয়াছি, পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

ময়মনসিংহ।
১৮২৮ শকাব্দা।

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য।

শুদ্ধি সূচী।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	বিটপি	বিটপী
২১	মধ্যবিত্ত	মধ্যবিৎ
৪৫	They	Thy
"	blots	bolts
১৩২	নরাপ্সদ	নরাপ্সরা

চিত্র সূচী।

চিত্র নির্দ্দেশ	পৃষ্ঠা
গ্রন্থকর্ত্তার বিশ বৎসর বয়সের হাফ্‌টোন	
১। বন হইতে বনা হবে ব্যাঘ্রের পলায়ন	১২
২। হাতীর উপর হরিণ উত্তোলন	২০
৩। রজ্জু অবলম্বনে ভগ্নবাড়ী হইতে অবতরণ	৩৩
৪। হরিণ শিকার	৪৬
৫। ময়ূরের নাচ	৬৭
৬। বন্য মোরগ শিকার	৬৯
৭। সাগর দীঘির পারে বিশ্রাম	৮৬
৮। মহিষ শিকার	৮৮
৯। নলবনে বরাহ	৯৭
১০। হাতীর পেছনে নেকড়েবাঘ	১১৪
১১। শালস্তূপের নিকট ভল্লুক	১৬৩
১২। বন্দুক ধরিবার প্রণালা	১৮২

শিকার-কাহিনী।

প্রথম প্রস্তাব।

মধুপুর শিবির—ময়মনসিংহ।

বাল্যকালে যখন নানাবিধ গ্রন্থে অদ্ভুত শিকার-কাহিনী পাঠ করিতাম, তখন সময়ে সময়ে শিকারী হইবার বাসনা মনের নিভৃত-প্রদেশে ধীরে ধীরে উদিত হইত। কল্পনায় দিব্য আমোদ অনুভব করিতাম। মানস-পটে স্বতঃই শিকারের কত বিচিত্র-চিত্র অঙ্কিত হইত।

ইচ্ছা করিলে অবশ্য শিকার শিখিবার আমার প্রতিবন্ধক কিছুই ছিল না। অর্থবল, লোকবল, সময়ের প্রাচুর্য্য কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল আধুনিক বাঙ্গালীর যে দোষ অর্থাৎ আলস্য, তায় আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। অন্যান্য বিষয়ে বড় একটা আলস্য ছিল না। কিন্তু শিকার করিতে হইবে, সে একটা ভাব, আমাকে কিছুতেই কার্য্যপরায়ণ

করিয়া তুলিতে পারিত না। তাহাতে বাঙ্গালী, সুতরাং অত বড় একটা বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সময় হইলেও তখন বাসনা হয় নাই।

আমার বয়স যখন ঊনিশ কি কুড়ি বৎসর, সেই সময় একবার তদানীন্তন কমিশনার সাহেব, জাহাজে চড়িয়া ময়মনসিংহে আসেন। জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের একটী ফ্রেঞ্চ-বন্দুক ছিল। সাহেব অর্থাভাবে পড়িয়া তাহা বিক্রয়াভিলাষী হন;—বন্দুকটী দেখিয়া, সেটী লইবার আমার বড়ই বাসনা হইল। কাপ্তেন সাহেব স্বীকৃত হওয়ায় আড়াই শত টাকা দিয়া সেই ফরাসী আগ্নেয়াস্ত্রটী খরিদ করিয়া লই। বলা বাহুল্য বন্দুক কি করিয়া ধরিতে হয়, তাহা তখনও আমি জানিতাম না;—বা ধরিবার যে একটা প্রবল সখ তাহাও ছিল না। খেয়াল হইল, বন্দুকটী কিনিয়া অপরের কাছে রাখিয়া দিলাম। বাঙ্গালীর হস্তে পড়িয়া বন্দুকের উজ্জ্বল ও মসৃণ দেহে যে কলঙ্ক ধরিয়াছিল তাহা পরিষ্কার করিতে শেষে অনেক দিন লাগিয়াছিল।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে টাঙ্গাইল বিভাগের সঃ ডিঃ অফিসর বাবু তারিণীপ্রসাদ রায় সরকারী কার্য্যোপলক্ষে মধুপুরে তাম্বু ফেলেন। কার্য্যোপলক্ষে আমাকেও তথায় যাইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে ঐ বন্দুকটী আমার সঙ্গেই ছিল।

এক দিন মধুর প্রভাতে ডেপুটী বাবু প্রস্তাব করিলেন, শিকারে যাইতে হইবে। তখনও আমি বন্দুক ধরিতে শিখি নাই, কিন্তু সখ হইল শিকারে যাইব। "ঢাল নাই তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার।" আমার অবশ্য ঢাল তলোয়ার ছিল

কিন্তু কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয় তাহাই জানিতাম না। তবুও সখ যখন হইয়াছে, তখন তাহাকে অতৃপ্ত বা অসম্পূর্ণ রাখা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ শিকারে যাইতে অস্বীকার করিলে ডেপুটী বাবু হয়ত ভাবিতে পারেন, আমার সাহস নাই, সুতরাং নিজের অক্ষমতা গোপন রাখিয়াই শিকারীদলভুক্ত হইলাম।

এই আমার প্রথম শিকার যাত্রা। মনে মনে নানারূপ কল্পনা হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ও ফরাসী শিকারীদের শিকারের বিবরণ চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। Zerald সাহেব কিরূপে আফ্রিকার ভীষণ সিংহ শিকার করিয়াছিলেন, কতবার কিরূপ ভীষণ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহার অনেকটা ঘটনা মনে পড়িল। অবশ্য এই বনে সেরূপ ভীষণ জন্তু বড় একটা নাই, তবুও অধীত বিষয়গুলি মনে পড়িতে লাগিল।

আমার শিকারের প্রবর্ত্তক তারিণী বাবু এবং আমি উভয়ে গোলা, গুলি, বারুদ, বন্দুক লইয়া শিকারীর বেশে মধুপুরের বিস্তৃত অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

বিশাল অরণ্যানীর সে শ্যামগম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার হৃদয় কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া কেমন একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-স্রোত প্রবাহিত হইল। সে দৃশ্য কি মনোরম, কি মহিমাময়, কি অনন্ত-ভাবব্যঞ্জক! কোথাও নিভৃতস্বভাবজাত অযত্ন-গ্রথিত লতাকুঞ্জে পুঞ্জীকৃত বনফুল, তাহাতে মধু লোভে অজস্র ভ্রমরকুলের মধুর গুঞ্জন! কোথাও উচ্চচূড় বৃক্ষশাখে, পত্রাচ্ছন্ন পল্লবিত লতাবিতানে

সুকণ্ঠ বিহঙ্গের কলগীতি, যেন স্বর্গের বীণার মত অমৃতবৃষ্টি করিতেছে। কোথাও দূরে শ্যামল বনভূমির উপর হরিণ-শিশু, জননীর সহিত ছুটিয়া ছুটিয়া ক্রীড়া করিতেছে! কোথাও পুষ্পশোভিত পলাশ বনে লুকোচুরি খেলিতেছে। অশঙ্কিতচিত্তে কোথাও বৃক্ষতলে তাহারা নিঃশব্দে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছে। তাহারা জানিত না যে স্বার্থভরা ক্রুর শিকার-বাসনা তাহাদের শোণিতে তর্পণ করিবার জন্য লুকোচুরির মত সাবধানে তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আমি যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে সেইখানেই কত শকুন্তলা, কত মেঘদূত, কত ঋতুসংহার লিখিয়া ফেলিতে পারিতাম! কিন্তু বিষয়ের কঠোরতার মধ্যে আমি লালিত পালিত। জীবনের সাধনাই হিসাবের কড়া ক্রান্তি লইয়া। তবুও আমার মত নীরস কঠোর শুষ্ক হৃদয়ে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে এমন এক তৃপ্তির ফোয়ারা উৎসারিত করিয়া দিল যে,—সে দৃশ্য হইতে স্থানান্তরে যাইতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। কবি-হৃদয় হইলে হয়ত জীব-হিংসাটা একবারেই ভুলিয়া যাইতাম, কিন্তু এ দৃশ্যে আমার মন মুগ্ধ হইলেও শিকার-বাসনা হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না।

ডেপুটী বাবু ওস্তাদ হইলেও এ যাত্রাটা আমাদের কেবল শিকার দেখিয়াই ফিরিতে হইল—শিকার মিলিল না।

পর বৎসর নিজেই উদ্যোগী হইয়া একটা Shooting-party (শিকারদল) সংগঠন করিলাম। তারপর দলবলে মধুপুরে তাম্বু ফেলিলাম। শিকার করিতে চলিলাম বটে, কিন্তু বোধোদয় দূরের কথা, শিকারের বর্ণপরিচয় তখনও শেষ হয়

নাই। শিক্ষানবিশীতে আছি মাত্র। হাতীর উপর বসিয়া একজন শিকার করেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া গুলি বারুদ যোগাড় করিয়া দেই। কিন্তু তাহাতেই কত আমোদ, কত স্ফূর্ত্তি! এবারকার শিকার একেবারে নিষ্ফল হইল না। গোটা কয়েক হরিণ শিকার করা গেল। আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ আমি একজন শিকারী বলিয়া জনসাধারণে পরিচিত হইলাম। শিকারের নাম শুনিলে এই জড় শিশুপ্রায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে তখন কেমন জ্বলন্ত বাসনা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত! এবং ক্রমশঃ আমি একাকী স্বতন্ত্র হাতীতে শিকার করিবার উপযুক্ত হইলাম। তার পর অনেক শিকার করিয়াছি, অনেকবার অনেক বিপদেও পড়িয়াছি। কিন্তু এবার আর সে সব বিষয় কিছু বলিব না। কিরূপে আমার প্রথম শিকার-বাসনা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিরূপে শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, শুধু তাহার একটী বৈচিত্র্যশূন্য প্রস্তাবনা মাত্র সহৃদয় পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। প্রথমতঃ বনভূমি দেখিয়া আমার মনে সে সময় যে ভাব জাগরিত হইয়াছিল,—নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র কবিতাটিতে তাহা কথঞ্চিৎ মাত্র ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইলাম।—

গহন বিপিনে অই বিটপি-নিচয়,
স্থিরমূর্ত্তি ঊর্দ্ধবাহু মহাযোগী প্রায়,
আছে দাঁড়াইয়া। তাহে লতা মাধবীর,
জড়াইয়া শ্যাম শিরে জটার মতন;
নীরব নিষ্পন্দ, তারা ধ্যান-নিমগন।
কোথাও নাহিক তথা জন-সমাগম,

শাখে পাখী, ফুলে ভৃঙ্গ দিতেছে ঝঙ্কার,
কোথাও কুরঙ্গ-শিশু, মুখে শার্দ্দূলের
বনভূমি কাঁপাইয়ে করিছে চীৎকার।
আমি তার মাঝে,—কেন জীব জগতের,
অগ্নিবাণ লয়ে করে, সংসার অনলে
উত্তাপিত হয়ে হায়! শান্তির আশায়
ভ্রমিয়ে বেড়াই বিধি! বুঝি না বিধান,
জানি না এ ব্রতে কিবা ঘটে পরিণাম!

——o——

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গাবতলী শিবির—ময়মনসিংহ।

শরদের সুনির্ম্মল শুভ্র-শোভন আকাশে, হেমন্ত আসিয়া যখন কুহেলিকা-জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, গভীর উত্তরের পবন যখন ক্রমে ক্রমে শ্যামলা ধরণীর অঙ্গে হিম-কণিকা ছড়াইতে লাগিল, তখন আমার আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, কেমন একটা আকুলতা মনে জাগিয়া উঠিল,—কেমন একটা অযাচিত সুখের আশায় মন মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ আমার বিষয়-কর্ম্ম-ক্লিষ্ট গুরুভারাক্রান্ত অন্তঃকরণটা কোনরূপ পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষায় যেন একান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িল। প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা! দেশ কাল ও অবস্থার সহিত, মানব-প্রকৃতি এমনই একটা কবিত্বময় ভাবে বিজড়িত যে, নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলেই মানব-হৃদয় কোনরূপ একটা ক্রীড়ার জন্য স্বতঃই উন্মত্ত হইয়া উঠে,—এবং বালকের প্রাণের,—সেই মধুর নর্ত্তনের মত একটা

মোহন ভাব, হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় অলক্ষিতে কোথাও ছুটিয়া পলাইতে চায়;—শিকারলোলুপ আমি,—আমার এই নীরস নিঠুর প্রাণটা আর কোথায় পালাইবে, যেখানে মানুষের সমাগম নাই,—যেখানে কেবলি— জঙ্গলের পর জঙ্গল, আর শ্বাপদকুলের "কিলি কিলি হিলি হিলি" বিকট ভৈরব নিনাদ,—সেই স্থানেই লক্ষ্য পড়িল, এবং শীতসমাগমে, শিকারের বিজয় ভেরী রণগম্ভীরে বাজিয়া উঠিল, প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বন্দুক পরিমার্জ্জন, গোলাগুলি প্রস্তুত ও হস্তি-সজ্জা ব্যাপারে,—ছোটখাট রকমের একটা অশ্বমেধ যজ্ঞের সূচনা অভিনীত হইতে লাগিল। হুজুরের হুকুম,—তামিল হইতে আর বেশী দিন লাগিল না;— কারণ এ সখের কাজ; অবশ্য অন্য কর্ম্ম হইলে, কর্ম্মচারিগণের ঠিকা মুহুরির প্রয়োজন হইত।

মাঘ মাসের শেষ ভাগে মধুপুরান্তর্গত "গাবতলী" নামক স্থানে তাম্বু ফেলিয়া সদল বলে আড্ডা করিয়া বসিলাম। পুরদৃশ্যপীড়িত নয়নে বন-পল্লীর উদাস উন্মুক্ত শ্যাম-শোভন দৃশ্য বড়ই মধুর লাগিল। দিনমান উৎসব ও উৎসাহে কাটিত বটে, কিন্তু রাত্রিতে দুরন্ত শীত। সে শীতের কাছে লেপ, কম্বল হার্ মানিল; কাজেই তাম্বুর মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা হইল। তখন দীপ্তকুণ্ডের প্রান্তে বসিয়া মধুর তাম্রকুট-ধূমে সুপ্ত কল্পনাকে জাগরিত করিয়া আসন্ন শিকারের একটা উদ্দীপনাপূর্ণ আলেখ্য অঙ্কিত করিতে করিতে পরম আরামে বেশ একটু উত্তাপ উপভোগ করিলাম।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি ও আমার সহচর উভয়ে

পক্ষী শিকারে বাহির হইলাম। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক কণ্টক-পরিবৃত জঙ্গলে একটা বন্য কুক্কুট ও দুইটী হংস শিকার করিয়া বেলা দশটার সময় তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম।

মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া আরাম কেদারায় দেহ ঢালিয়া মদিরমধুর তন্দ্রাবেশে বিশ্রামসুখে মগ্ন আছি; এমন সময়ে সেখানকার থানার দারোগা বাবু আসিয়া সংবাদ দিলেন, গ্রামের নিকট মধুপুর জঙ্গলে একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া তিনটা গোরু মারিয়াছে। আমরা ঐ বাঘ শিকার করিতে গেলে, তিনিও আমাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা সকলেই শিক্ষানবীশ নূতন লোক, তথাপি শিকারে আসিয়া ব্যাঘ্রসমাগম সংবাদে স্থির থাকিতে পারিলাম না।

আমরা শিকারে বাহির হওয়াই স্থির করিলাম। আদেশ-মাত্র হস্তিসকল সজ্জিত করিয়া তাম্বুর সম্মুখে আনীত হইল। আমরা আপন আপন বন্দুক লইয়া গজারোহণে শিকারে বহির্গত হইলাম। অল্পক্ষণ মধ্যে দারোগা মহাশয়ও নিজের অতি পুরাতন কলঙ্কলাঞ্ছিত দোনালা বুনিয়াদী বন্দুকটী লইয়া আমাদিগের সহিত যোগদান করিলেন। সচল অচলমালার ন্যায় হস্তিসকল আমাদিগকে গন্তব্য স্থানাভিমুখে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইবামাত্র একটী শোণিতলিপ্ত গো-দেহ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। দন্তাঘাত চিহ্নাদি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, বধকর্ত্তা নখায়ুধ-বংশে বিশেষ বিক্রান্ত—ব্যাঘ্রকুলতিলক। আশ্চর্য্য এই, ব্যাঘ্রমহাশয় তিনটা গোরু মারিয়াছিলেন বটে—কিন্তু একটীও লইয়া যান

নাই, কি তাহাদের মাংসে জঠরজ্বালা নিবারণ করেন নাই, শুধু মারিয়াই ফেলিয়া গিয়াছেন,—বোধ হয় আধুনিক উদারনীতির সহিত তাঁহার একান্ত সহানুভূতি আছে।

আমরা কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দর্শনবাসনায় চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থমনোরথে নূতন শিকারের অন্বেষণে পথান্তরে গমন করিলাম। 'একচালা' (উচ্চভূমি) হইতে 'বাইদ' (নিম্নভূমি) এবং বাইদ হইতে একচালায় বিচরণ করিতে করিতে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া গেলাম, পথিমধ্যে দুইটী হরিণ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি, চপল লোচনের কি মধুর লীলাবিলাস! সহচর ও দারোগা মহাশয় বন্দুক উঠাইলেন। খট্ করিয়া ঘোড়া পড়িল, শব্দ শান্তি-শীতল-বনানী মধ্যে শিকারীযুগলের মৃগয়াগৌরব ঘোষণা করিয়া দূর গহনে মিলাইয়া গেল। অনাহত হরিণযুগল বারেকমাত্র আমাদিগের প্রতি তড়িচ্চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পলক মধ্যে অন্তর্হিত হইল। শিকারী দুইজনের মুখমণ্ডলে একটা অনাহূত গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাদিগের মনের অবস্থা যে তখন কিরূপ হইয়াছিল তাহা আর নাই বলিলাম। বলিলে হয়ত, এখনও তাঁহারা একটু মুখ মলিন করিবেন।

বসন্ত-পবনারূঢ় জলদদলের ন্যায় হস্তিগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল—গতির বিরাম ছিল না। আমরা একটা অত্যুচ্চ ভূমির উপর উঠিলাম। আমাদিগের আগমন শব্দে দুই একটা শশক দীর্ঘতৃণতলস্থ শয্যা ত্যাগ করিয়া দৌড়াইয়া গেল। তখন অপরাহ্ণ—নিবিড় নীলিমাকোলে সহস্র সুবর্ণ শিখা জ্বালিয়া সূর্য্যাস্তের আয়োজন করিতেছে। ছায়াবিচিত্র বনের

রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বর্ণালোক প্রবেশ করিয়া বনভূমির মণি-মেখলা রচনা করিতেছে। কোথাও মধুপপুঞ্জের শেষ চাঞ্চল্যে বনবীথিকা-বিলাসিনী লতিকার ফুলবেণী খুলিয়া যাইতেছে, কোথাও একদল গুঞ্জনশীল মধুমক্ষিকা বন হইতে আসিয়া তান ধরিতে ধরিতে অদৃশ্য হইয়া গহনকুঞ্জে লুকাইয়া যাইতেছে। কোথাও এক প্রবীণ দেবদারু শাখায় একটী ময়ূর পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া ভূতলে ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করিতেছে। চারি দিক হইতে বনচারী কীট-পতঙ্গের অনিশ্চিত করুণ-মধুর শব্দ উঠিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা আকুল গম্ভীরভাব জাগাইয়া তুলিল। যে দিকে চাই, শ্যামরূপের অনন্ত সমুদ্র, পবনের মন্দ আন্দোলনে হেলিতে দুলিতে চারুমর্ম্মর-নিনাদে দিনকরের অন্তিম কিরণে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কাননকুন্তলা-ধরণীর কি মনোমোহিনী শোভা! আমরা প্রকৃতির এমন শ্যামসুন্দর কেলিকুঞ্জে একটা রক্তমুখী তৃষিত বাসনা বহন করিয়া ফিরিতেছি। আমার প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা হইল। ইঙ্গিত মাত্র মাহুত, হাতীর মুখ ফিরাইল।

দারোগা বাবু বলিলেন, "আর একটা বাইদ না দেখিয়া ফিরা অপরামর্শ।" তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, আমরা সেই বাইদ অভিমুখে চলিলাম। বাইদের নাম এখন ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় "জলৈরবাইদ" হইবে।

বাইদের অধিক দূর না যাইতেই দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড বাঘ বাইদের দিকে মুখ করিয়া একটা চালার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার বিপুল দেহ-সৌষ্ঠব ও পরম নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া আমরা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। বাঘটা আমাদের খুব নিকটেই ছিল, ব্যবধান দশ পনর হাত হইবে।

গুলি করিবার সুবিধাও বেশ,—কিন্তু বন্দুক চালায় কে ? আমি ত Novice, আমার সহচরও তথৈবচ। দারোগা মহাশয় ? "সোঽপাপিষ্ঠস্ততোঽধমঃ।" তিনি কেবল নিরীহ চৌকিদার ও গ্রাম্যলোকের উপরই ভ্রুকুটি বিস্তারে অভ্যস্ত,—কিন্তু মহামান্য ব্যাঘ্র মহাশয় যে· তাঁহাকে লাঙ্গুল দেখাইয়া গেলেন, তিনি তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। বাঘটা বুঝি আমাদের গুণপণা বুঝিতে পারিয়াই নিশ্চিন্তমনে বসিয়াছিল। আমাদিগের সঙ্গে দুইজন "জাত্‌শিকারী" ছিল। কিন্তু বাঘের অখণ্ড-লাঞ্ছিত পীনোন্নত দেহমহিমা,—দংষ্ট্রাকরাল আনন-শোভা ও অতুল সাহস দেখিয়াই শিকারীদিগের মগজ বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল।

আমাদের অনেক প্রলোভনপূর্ণ উৎসাহ বাক্য এবং উত্তেজনায় যদিও তাহারা গুলি করিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু ততক্ষণে 'ফসল' ফুরাইয়াছিল। বাঘ ত আর আমাদিগকে আগন্তুক দেখিয়া সান্ধ্য-সমিতির নিমন্ত্রণে বাহির হয় নাই, সুতরাং সে মনুষ্যজাতি ও কুঞ্জরকুলের এরূপ অপ্রত্যাশিত সমাগম দেখিয়া সময় বুঝিয়া জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা শশব্যস্তে বাইদের উপর উঠিয়া বেশ দেখিতে পাইলাম ব্যাঘ্র বনান্তরাল দিয়া গুরুচরণবিন্যাসে বেতসকুঞ্জ কম্পিত করিয়া ধীরে ধীরে বনমধ্যে অগ্রসর হইতেছে। তাহার শরীরটী যেন আর ফুরায় না। ঠিক যেন বোধ হইল কে একখানা চৌদ্দ পনর হাত লম্বা "নামাবলী" বনের মধ্য দিয়া টানিয়া লইতেছে।

তখন শিকারী বলিল,—"হুজুর, শের ত ভাগ্‌গিয়া।" তখন



বন হইতে বনান্তরে ব্যাঘ্রের পলায়ন—১২ পৃঃ

হুজুর আর করেন কি! তাহাদের সাহসের বাহাদুরী দিয়া,—এবং জলপানির বন্দোবস্তটা একটু বাড়াইয়া,—"ঘরমুখো" বাঙ্গালী তাম্বুতে ফিরিলেন। ব্যাঘ্র শিকার আর হইল না; শুধু "ঘ্রাণেনার্দ্ধভোজনম্" করিয়াই ফিরিতে হইল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই—ব্যাঘ্রটী এতগুলি হাতী ও মানুষের সমক্ষে নির্ব্বিকচিত্তে এতক্ষণ বসিয়া রহিল;—একটু নড়িল না বা সঙ্কুচিত হইল না, ইহার যে নিগূঢ় রহস্য কি,—কিসে ব্যাঘ্র মহাশয় আমাদিগের প্রতি অতটা অবজ্ঞা, অতটা হেয়জ্ঞান করিলেন, তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারি নাই,—জানিতে পারি নাই,—জানিবার শক্তিও ছিল না; কিন্তু এখন,—দেখিয়া শুনিয়া, শ্বাপদ-চরিত্র আলোচনা করিয়া, যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি,—তাহাতে বুঝিতে পারি, তাহার ভিতর বিস্তর নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে। লক্ষণ দেখিয়াই শ্বাপদগণ, শিকারী অশিকারী চিনিতে পারে। বোধ করি, আমাদের গতিবিধিতে এবং আকার প্রকারে ব্যাঘ্র মহাশয় আমাদিগকে নিতান্ত অশিকারী ভাবিয়াই এই অবজ্ঞার ভাবটা প্রকাশ করিয়াছিলেন; যথা—নদীর পাড়ে চকা-চকী বসিয়া থাকে—মাল্লারা নিকট দিয়া গুণ টানিয়া যায়, তবুও তাহারা ভয় করে না, কিন্তু শিকারী দেখিলেই ভয়ে উড়িয়া পলায়ন করে; এ স্থলেও ইহাই রহস্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

গাবতলী শিবির—ময়মনসিংহ।

মধুপুরের বন অতি বিস্তীর্ণ। অনেকের মনে হইতে পারে জঙ্গলটী 'নেপাল ডোয়ার', 'ভুটান ডোয়ার' অথবা জলপাইগুড়ির ভীষণ অরণ্যানীর মত অতি ভয়ানক সঙ্কটসঙ্কুল দুর্গম স্থান। প্রকৃত পক্ষে তদ্রূপ না হইলেও কাল-প্রভাবে বনের অবস্থা যে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দৈর্ঘ্যে বনের এক সীমা ঢাকা, অন্য সীমা "কড়ৈবাড়ী" বা "গারো শৈলশ্রেণী"; বিস্তৃতি অন্যূন এক প্রহরের পথেরও উপর। বন মধ্যে বিচরণ করিলে এখনও অনেক প্রাচীন অট্টালিকা, সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপ ও বিশাল দীর্ঘিকা সকল দৃষ্টিগোচর হয়। দীর্ঘিকাগুলি যেমন বিস্তৃত, জলও তেমনি শীতল, স্বচ্ছ ও সুপেয়। জনসমাগমশূন্য বিপুল অরণ্যানী মধ্যে সহসা লোকালয়ের এইরূপ বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইলে হৃদয় মধ্যে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত অননুভূতপূর্ব্ব এক অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, স্মৃতির সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে থাকে। এই সব ভগ্ন অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে, বিদীর্ণ প্রাচীরের বক্ষে বক্ষে, দীর্ঘিকার সোপানে সোপানে, অতীতকালের এক মহান্

আনন্দোজ্জ্বল, বাণিজ্যবিলাস-সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদের কত অলিখিত ইতিহাস, কত অকথিত কাহিনী যেন অলক্ষিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একদা এই সরসী-সোপানমালা লীলাললিতগামিনী কামিনীকুলের অলক্তলাঞ্ছিত চরণের মধুর মঞ্জীরধ্বনিতে মুখরিত হইত। ঐ সব অট্টালিকার প্রকোষ্ঠ হইতে যুবক ও প্রৌঢ় জনের উদার হাস্য, স্মিতপুষ্পোপম শিশুদের সুধাকণ্ঠের সহিত মিলিয়া কত আনন্দ প্রচার করিত। ঐ স্থানে হয়ত ভূরিদ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ পণ্যবীথিকা সকল বিরাজিত থাকিয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মীর গৌরব ঘোষণা করিত,—কিন্তু হায়! আজ সে সুন্দর সমৃদ্ধ জনপদ ব্যাঘ্র-ভল্লুকসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য! আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ নহি—তবু যতদূর দেখিয়াছি,—ভগ্নাবশেষগুলি অতি প্রাচীনকালের বলিয়া বোধ হয়। মধুপুরের গড় এক সময়ে যে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তাহার প্রমাণ এখনও এই বন মধ্যে দেদীপ্যমান।

এক দিবস আমরা শিকারে বাহির হইয়াছি, ক্রমশঃ চলিতেছি; চলিতে চলিতে বন মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। বেলা অনেক। সূর্য্য মাথার উপর। পত্র-বিচ্ছেদসমাগত মধ্যাহ্নের প্রখর রবিকিরণে শাখাকিশলয়াবৃত কানন-তিমির অনেক অপনীত হইয়াছে। অবাধ বায়ু-সঞ্চার-বিরহে জঙ্গল মধ্যে উত্তাপও বিলক্ষণ। আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত; কোন জলাশয় সন্নিহিত ছায়াস্নিগ্ধ স্থানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমাদিগের সহচর পথ-প্রদর্শক বলিল, "নিকটে ভগদত্ত রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, সেখানে গেলে উত্তম স্থান ও জলাশয় মিলিবে।"

পথপ্রদর্শকের কথানুসারে আমরা ভগ্ন প্রাসাদের অভিমুখে চলিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া সলম্ফে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলাম। আমার কৌতূহলী কল্পনা যে প্রাচীন পুরচিত্র মানসনয়নের সম্মুখে অঙ্কিত করিতেছিল, তাহার সমস্তটা ব্যর্থ হইল; হায়!

"যদুপতে ক্বগতা মথুরাপুরী
রঘুপতে ক্বগতা উত্তরকোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরু মনঃস্থিরং
নসদিদং জগৎ ইত্যবধারয়।"—

সে রাজাও নাই, রাজপ্রাসাদও নাই। সে কারুকার্য্যবহুল স্তম্ভশ্রেণী—সে গগনস্পর্শী প্রাসাদ-শিখর এখন ধরণীর ধূলিতে পরিণত হইয়াছে। কেবল অতীতের স্মৃতি উদ্বোধনের জন্য ভিত্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা সমস্ত স্থানটী প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলাম, প্রায় চারি পাঁচ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া প্রাসাদ-ভিত্তি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ভিত্তির উপর বৃহৎ বৃহৎ বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া উন্নতশীর্ষে শ্যামমহিমা-ভরে মত্ত ঝটিকার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। ভিত্তির অবস্থান দেখিয়া বুঝিলাম এক সময়ে এই স্থানে প্রকাণ্ড অট্টালিকা দণ্ডায়মান ছিল। ইমারৎ কতকালের প্রাচীন তাহার কোন ইতিহাস নাই। সে সম্বন্ধে কেহ কিছু অবগত আছেন এরূপও বোধ হইল না, তাই বিশেষ আগ্রহের সহিত ভিত্তি খোদিত করিয়া কয়েকখানি ইট আনিয়াছিলাম এবং ঐ গড়ের অপরাপর ভগ্নাবশেষের আরও কয়েকখানি ইট সংগ্রহ করিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়কে প্রদান

করিয়াছিলাম। তিনি সেগুলি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—তিনি যথাযথ পরীক্ষা করিয়া এই পুরাকীর্ত্তির বিষয় নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমার দেশের দুর্ভাগ্য যে উহা আর হইল না, মনস্বী রাজেন্দ্রলাল কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মনের উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা মনেই নিভিয়া গেল।

যাক সে সঁব কথায় আর কাজ নাই। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, শিকারকাহিনী লিখিতে বসিয়া, প্রত্নতত্ত্বের বিড়ম্বনা কেন? কিন্তু কি জানি কেন! পুরাকীর্ত্তির কেমন একটা আকর্ষণ আছে;—যখনই যেখানে অতীতের চরণচিহ্ন দেখিয়াছি, তখনই হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় শোক ও ঔদাস্যের অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছে। আশা করি পাঠক, এ অপ্রাসঙ্গিকতা মার্জ্জনা করিবেন। সে দিন ভগ্ন অট্টালিকা ও ইষ্টকস্তূপের মধ্যেই কাটাইলাম। অপরাহ্নে সকলে একটী বিশাল দীর্ঘাকার সোপানচত্বরে, পুষ্পপুলকিত শ্যামরম্যবকুলবীথিকার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া মধুগন্ধবাহী পবনের মৃদুলসংস্পর্শে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বনদেবীর দর্পণের মত দীর্ঘিকা,—উজ্জ্বল অনাবিল নীল শীতল স্বচ্ছ; কোথাও সেই খণ্ডনীলিমাতুল্য বাপীজলে শুভ্রজলজফুলে খচিত রহিয়াছে, কোথাও অপরাহ্নের ধীর-পবনস্পর্শে মৃদুবীচিবিভঙ্গে স্বর্ণরৌদ্রে মণিমাণিক্য ছড়াইয়া দিয়া জলচর বিহঙ্গমটীকে মন্দ মন্দ দোলাইতেছে। তীরে ঘনবনরাজি। কয়েকটী উদ্‌গ্রীব দীর্ঘ তালবৃক্ষ, বনের উপর মাথা তুলিয়া দীঘির নির্ম্মল নীরমধ্যে গগন সমেত বনের সলিল-লীলাচঞ্চল প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছে। এখানে,

জলচর পক্ষীর কলনাদ, ওখানে বনবিহঙ্গের দূরশ্রুত তান, শিরোপরে অনিলবিক্ষিপ্ত পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি, সকলে মিলিয়া কাণে একটী মধুর সন্ধ্যার রাগিণী বাজিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার কালো ছায়া বনানীর শ্যামশীর্ষ ও দীঘির নীল জলের উপর অবতীর্ণ হইল। আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া তাম্বুর অভিমুখে ফিরিলাম। পঁহুছিতে একটু রাত্রি হইল। আজিকার শিকার এই পর্য্যন্ত।

পরদিন "গাবতলী" ছাড়িয়া "কাঁকরাইদ" নামক স্থানে তাম্বু ফেলিলাম। দিনমানটা বিশ্রামালাপ, সিগারের ধূম ও দিবাস্বপ্নে একরূপ কাটিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি সুদীর্ঘ বিশ্রামের পর প্রত্যুষেই আমরা শিকারে বাহির হইলাম। হাতীগুলি প্রভাতের হাওয়া পাইয়া বেশ সানন্দ গতিতে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। আমরা বনান্তরাল হইতে নীরব অরুণোদয় দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিনি প্রভাত-পবন-স্পৃষ্ট-প্রফুল্ল-হৃদয়ে ভৈরোঁতে আমারই রচিত একটী গান ধরিলেন ;—

ভৈরোঁ—তাল ঠুংরি।

"জয় রঘুনন্দন, ভবভয়ভঞ্জন,
জগদীশ, মনীষ মহেশ হে।
তুমি ভব কারণ, তুমি ভবতারণ,
সারণ-বারণ কারণ হে ॥
তুমি জ্যোতির্ম্ময়, জগত আশ্রয়,
ভকত-জীবন, দীনশরণ হে ॥

অরুণ উদিল, ভুবন উজিল,
হাসিল, ভাসিল, অতুল প্রেমে হে ॥
যে দিকে ফিরে নয়ন, হেরি তব প্রেমানন
প্রকৃতি আকৃতি তুমি পাপহারী হে ॥
এই ঊষাকালে, ভক্তি ফুল তুলে,
সূর্য্যকান্তে, পদপ্রান্তে দিবে হে ॥”

আমরা ক্রমে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। সঙ্গে ছয়টী হস্তী ছিল, তাহারা ইঙ্গিতমাত্রে শিকারের অন্বেষণে “জঙ্গল ভাঙ্গিতে” আরম্ভ করিল। সমুদ্রমন্থনে সুধা উঠিয়াছিল, রূপের কিরণে দিগন্ত আলোকিত করিয়া লোকমাতা রমা দেখা দিয়াছিলেন, দেবতার ভাগ্যে আরও কত কি মিলিয়াছিল। আমাদের ক্ষুদ্র আশা—বনমন্থন করিয়া কি একটী শিকারও মিলিবে না? জঙ্গল ভাঙ্গার গোলযোগে আমাদের সঙ্গী শিকারীর হাতী ও একটী গদীর হাতী আমাদের দল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। আমরা কিছু পশ্চাতে পড়িলাম। আমরা করিপদদলিত বনরেখা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে দুই চারি বার শিকার লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোড়া হইল। কিন্তু কেমনই কুগ্রহ! একটী জানোয়ারও সহচর শিকারীদের হাতে পশুলীলা সম্বরণ করিতে রাজি হইল না!

তখন বেলা ৯টা কি ৯॥টা। অতৃপ্ত বাসনার দংশনে ব্যথিতচিত্তে তাম্বুতে ফিরিব কি না, ইতস্ততঃ করিতেছি; সহসা আমাদিগের পুরোভাগের বনমধ্যে বামদিকে “গুড়ুম্” করিয়া একটা আওয়াজ হইল; ইঙ্গিত মাত্রই হস্তিসকল শ্রেণী-

ব[illegible] হইয়া দাঁড়াইল। চারিদিক আসন্নমধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতায় মগ্ন, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই; কাজেই আমরা কিছুক্ষণ এই স্থানেই চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এদিক ওদিক দেখিতেছি, কাণ পাতিয়া শব্দ লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতেছি, সহসা আমাদের সহচর শিকারী আসিয়া অতি উৎসাহের সহিত সঙ্কেত করিল। আমরা পরমোৎসাহে উগ্র উত্তেজনার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেখি, এক নব-পল্লবিত গজারীবৃক্ষের বনমধ্যে একটা বৃহৎ "গাউজ" রক্তাক্ত দেহে অন্তিম যন্ত্রণায় মুমূর্ষু হইয়া অঙ্গোৎক্ষেপণ করিতেছে। নিষ্পত্র শাখার মত খুরাগ্র শৃঙ্গে রক্ত কর্দ্দম সংলগ্ন রহিয়াছে। আর বিলম্ব সহিল না, আনন্দ-চঞ্চল হৃদয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিজেই তাহাকে অপর একটী হাতীর গদীর উপর উঠাইতে চেষ্টা করিলাম। রুধির ধারায় কাপড় ভিজিয়া গেল, আরও কয়েকজন লোকের সাহায্যে হরিণটাকে হাতীর পিঠের উপর তুলিয়া লইলাম। নিজে বধ করি নাই, তাহাতেই এই আনন্দ, স্বহস্তে শিকার করিতে পারিলে না জানি কি করিতাম। আর কিছু না হউক বন্ধুবান্ধবগণকে যে একটা জমকাল রকম পার্টি দিয়া ফেলিতাম তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। এ যাত্রায় আরও কয়েকটী বৃহৎ হরিণ শিকার হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে পারি:—

"Slow and steady wins the race."



হাতীর উপর হরিণ উত্তোলন—২০ পৃঃ

চতুর্থ প্রস্তাব।

মধুপুর শিবির—ময়মনসিংহ।

আমরা কাঁকরাইদ হইতে তাম্বু উঠাইয়া মধুপুরে ক্যাম্প করিলাম। এ যে সময়ের কথা বলিতেছি,—মধুপুরে তখন একটী পোলিশ ষ্টেশন ছিল।

“জয়েনসাহি পাহাড়” বা “মধুপুরের জঙ্গলের” উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক ব্যাপিয়া বংশাল নদী প্রবাহিত। এই নদীর জল এত পরিষ্কার, সুস্বাদু এবং শীতল যে, শ্রান্ত কলেবরে উহার এক গ্লাস জল পান করিলে বরফের তৃপ্তি অনুভূত হইয়া থাকে।

এই নদীতীরে জঙ্গলাবৃত প্রাচীন মধুপুর পল্লি অবস্থিত। পল্লিটী অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু উহার অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই যে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ছিল, তাহা তাহাদিগের বাড়ী ঘরের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টেই বিলক্ষণ অনুমান করা যায়। দুই একটা জীর্ণ দালান তখনও বর্ত্তমান ছিল।

ঘরগুলি বেশ বড় বড় ও সুন্দর। তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে, ঐ গ্রামবাসিগণ পরপদলেহন-ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিল। স্বাধীন ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্য ইত্যাদি দ্বারা তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিত। কেহ

পরমুখপ্রেক্ষী ছিল না। দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর দুয়ার—সকলের বাড়ীর সম্মুখে অথবা পার্শ্বে বেশ ছোট খাট রকমের ফুল ও শাক সব্জির বাগান—গেঁদা, বেলী, টগর, যুঁই, গোপী-কাঞ্চন এবং শশা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দ্বারা এমনি সুসজ্জিত যে, দেখিলেই প্রাণে অতুল আনন্দের উদ্রেক হয়।

ঐ সমস্ত গৃহস্থের তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে, তাহারা যে সুখস্বচ্ছন্দে ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। জানিতে পারিয়াছিলাম, জায়গা, জমি, ভিটা, বাগ বাগিচা প্রভৃতি সকলেরই প্রচুর পরিমাণে ছিল। জমির উৎপন্ন ধান ও শাক সব্জি ইত্যাদিতে সকলেরই এক রকম সুখে সংসার নির্ব্বাহ হইত। কাহার অভাবও পড়িত না, মজুতও থাকিত না। তখনও ঐ গ্রামে নবীন সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই। তাহারা রেলগাড়ী দেখে নাই,—ষ্টিমারে চড়ে নাই,—গ্যাস কিম্বা বিদ্যুতের আলো তখনও তাহাদের অন্ধকার অপনীত করিতে সুযোগ পায় নাই। সাধের বোম্বাই শাড়ী সেখানকার নারী-মহলে সৌখিনতার পরওয়ানা জারি করে নাই। জলতরঙ্গ মলের তরঙ্গ-ললিত-মধুর ধ্বনি তখনও তাহাদের মনে মোহ জন্মাইতে পারে নাই। বিলাতী জুতা আর কোট,—তখন পোর্ট কমিশনরের খাতাতেই জমা থাকিত, সে অঞ্চলে আর তাহার রপ্তানী ছিল না। মোট কথা তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বেশী ছিল না,—তৃপ্তি সহজলব্ধ ছিল। স্বদেশ-উৎপন্ন সামগ্রী তাহাদের স্বর্গাদপী গরিয়সী ছিল। হায় সে দিন আবার কবে বাঙ্গালীর ভাগ্যে উদয় হইবে! কবে বঙ্গ-লক্ষ্মী প্রসন্না হইবেন। বংশাল নদী যদিও খুব প্রশস্ত নয়, গঙ্গা, ব্রহ্ম-

পুত্রের তুলনায় অনেকটা পশ্চাৎপদ, কিন্তু তবু নদীটিতে এত অধিক পরিমাণে জল থাকিত যে বারমাস নৌকা গমনাগমন করিতে কোনও বাধা ছিল না।

আমাদের ক্যাম্প ঐ নদীতটেই অবস্থিত ছিল। নদী কুলু কুলু মধুর নিনাদে তরতর বহিয়া যাইতেছে, মৃদুল তরঙ্গ-ভঙ্গে তরীগুলি রঙ্গে রঙ্গে পাল তুলিয়া, দাঁড় বাহিয়া সরোবর-বক্ষচারী ক্রীড়ামত্ত রাজহংসকুলের মত তরঙ্গের মাথা ভাঙ্গিয়া উজানে ভাঁটীতে ছুটাছুটি করিতেছে; ইত্যাদি দৃশ্য তখন যে কিরূপ লাগিয়াছিল ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসাধ্য। নৌকা-গুলি দূরদেশ হইতে বাণিজ্য উদ্দেশে তথায় আসিত। ব্যব-সায়ের সামগ্রী তেমন বেশী আর কিছুই নয়,—ধান, চাউল, হাঁড়ী পাতিল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষই আমদানী রপ্তানী হইত। বহুবার ঐ সমস্ত নৌকার মাঝিদের মুখে শুনি-য়াছি,—জলপথে মধুপুরে আসিতে, সময়ে সময়ে বাঘ, ভালুক ও মহিষ প্রভৃতি শ্বাপদগণের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিত।

এই মধুপুর গ্রামে পুঁটিয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত, বহু প্রাচীন একটী দেবালয় আছে। তাহাতে শ্রীশ্রীমদনমোহনের বিগ্রহ স্থাপিত। ক্ষুধাতুর পথিকগণকে এই দেবালয়ে আশ্রয় ও প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। জানিতে পারিলাম দেব-সেবার কার্য্য অতি সুচারুরূপেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

ঐ নদীর তীরস্থিত, নিবিড়পল্লবিত একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে আমি ও আমার সহচর শিকারী বসিয়া তাম্রকূট সেবন ও তাম্বুলচর্ব্বণ পূর্ব্বক খোস্‌গল্পের ঢেউয়ে প্রাণটাকে ঢালিয়া দিয়াছি—এমন সময় ঐ থানার দারোগা বাবু আমার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সময় ও অবস্থার উপযোগী একখানা জলচৌকির উপর তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলিয়া আপ্যায়িত করা হইল। তিনি শিকার সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপনান্তে আমরা কোথায় কি কি শিকার করিয়াছি তাহার ছোট খাট রকমের একখানা কৈফিয়ৎ লইলেন। তাঁহার আলাপ ও ভাবভঙ্গিতে আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম,—তিনি আমাকে একজন পাকা শিকারীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইয়াছেন। তা না করিবার কথাও ত নয়! কারণ আমাদের এই শ্রেণীর মধ্যে আমিই যে প্রথম শিকারী, এইরূপ পুরুষোচিত ব্যসনের,—অন্ততঃ ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যে আমিই একরূপ প্রথম পথপ্রদর্শক। বোধ করি না এইরূপ একটা লাঞ্ছিত ক্রীড়ার জন্য সাধের সুখনিবাস পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কটসঙ্কুল অরণ্যময় প্রদেশে আমার মত আর কেহ 'Jungly-life' যাপন করিয়াছেন।

দারোগা বাবু বিদায় হওয়ার ক্ষণেক পূর্ব্বে জানাইলেন "রূপগিরি" সন্ন্যাসীর বাড়ী আমি দেখিয়াছি কি না,—উহা দেখিবার একটী জিনিষ এবং আমাদের তাম্বু হইতে উহা বড় বেশী দূরেও নয়; অবশেষে ঐ পরিত্যক্ত ভগ্ন বাড়ীর মধ্যে ছোট খাট রকমের ব্যাঘ্র মহাশয়গণও যে সময়ে সময়ে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন এ কথাও বলিলেন। আমরা উহা দেখিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি একজন পথপ্রদর্শক দিতেও সম্মত আছেন। তাঁহার এই সদ্ব্যবহারে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পর দিন প্রাতে সেই বাড়ী দেখিতে যাইব এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলাম, এবং

তাঁহার কোন অসুবিধা না হইলে, তিনি সঙ্গে গেলে, আমি বিশেষ সুখী হইব এ কথাও তাঁহাকে বলিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে সঙ্গীয় হস্তিসকল রীতিমত শিকারের সজ্জায় (অর্থাৎ "গদী" ও "চারিজামা" ইত্যাদি) সজ্জিত হইয়া তাম্বুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমরাও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শিকারীবেশে সশস্ত্রে গজারোহণে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম। রূপগিরি সন্ন্যাসীর বাড়ী যাইতে হইলে থানার সম্মুখ দিয়া ভিন্ন যাইবার আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। আমরা থানার সম্মুখে যাইয়াই দারোগা বাবুকে সংবাদ দিলাম। তিনি স্বয়ং আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া চলিলেন।

রাস্তায় যাইতে যাইতে অনেক খোষ গল্প হইল,—তিনি যে পুলিশ কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন ধুরন্ধর, বহুতর চোর, ডাকাত, খুনী আসামী ধরিয়াছেন এবং চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোককে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছেন, তাহা বলিতেও ভুলিলেন না।

স্থূলতঃ, তিনি যে পুলিশের মধ্যে একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী তাহা তাঁহার আলাপ, ব্যবহার এবং রজতশুভ্রশ্মশ্রুরাজিই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। যাহা হউক, এইরূপ বিস্তর "দিল্লীলক্ষ্ণৌর" টপ্পা চলিতে লাগিল এবং আমরা সন্ন্যাসীর বাটীর দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রাতঃসময় অধিক গরম ছিল না, বেশ নাতিশীতোষ্ণভাব, একরূপ প্রফুল্লিত ভাবেই সময়টা বহিয়া যাইতে লাগিল, রাস্তায় আমার সঙ্গী শিকারী কয়েকটী ঘুঘু বধ করিলেন, আমি অবশ্য স্বতন্ত্র হাতীতে স্বতন্ত্র বন্দুক লইয়াই ছিলাম, আমার

হাবভাব দেখিয়া দারোগা বাবু ক্ষণকাল পরে খুব বড় রকমের একটী ঘুঘু দেখাইয়া মারিবার জন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু আমি তো মূর্ত্তিমান! ঈষৎ হাস্য করিয়া আমার অক্ষমতা গোপন রাখিয়া দারোগা বাবুকে বলিলাম—"ও সব কাক ঘুঘু মারিবার জন্য ইঁহারাই আছেন,—ও সব ছোট (চিড়িয়া) শিকারে আমি নই।" এ যাত্রা ত কৌশলেই মান রক্ষা করিলাম কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম যে "মুণ্ডমালার দাঁত খামটীতে" আর অধিক দিন চলিবে না, অতএব সঙ্কল্প করিলাম বাড়ী ফিরিয়া নিশ্চয়ই এবার সযত্নে বন্দুক অভ্যাস করিব।

আমরা রূপগিরি সন্ন্যাসীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি অথচ বাড়ীটী দেখিতে পাই নাই ; আমি দারোগা বাবুকে বলিলাম, আর কতদূর মহাশয়, তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এই যে নিকটেই—এক শত হাতও হইবে না।" বস্তুতঃ বাড়ীটী অধিক দূরেও ছিল না, সম্মুখে কতকগুলি প্রকাণ্ড শাল, অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ী বৃক্ষে আবৃত থাকায়, বাড়ীটি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। আমরা ঐ গাছগুলি বামে ফেলিয়া যেমনি দক্ষিণে ঘুরিয়াছি, অমনি সম্মুখে একটী বৃহৎ জীর্ণ ও অসংস্কৃত দ্বিতল অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। উহার প্রশস্ত বারেন্দা, সম্মুখে, উপরে, নীচে সমভাবে সরল স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত। বাড়ীটী কালে যে বেশ জাঁকজমকের এবং ধনীর বিলাসভবন ছিল, তাহারই পরিচায়ক।

জনশ্রুতি, ব্রিটিশসিংহের আগমনের অব্যবহিত পরে রূপগিরি সন্ন্যাসী তৎসময়ে এই মধুপুর প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন. তাঁহার অধীনে পাঁচ সাত শত "রামায়ৎ"

সৈন্যসামন্তের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এইরূপ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই, বঙ্কিম বাবুর "আনন্দ মঠের" ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

বাড়ীর নিকটে গিয়াই আমরা হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইলাম, এবং প্রথমতঃ বাড়ীর চতুর্দ্দিকটা বেশ করিয়া একবার বেড়াইয়া দেখিলাম। কালবিধিমতে বাড়ীটী দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত (Well fortified) দোহারা প্রাচীর অর্থাৎ একটী বড় প্রাচীরের পর আর একটী ক্ষুদ্রতর প্রাচীরে বেষ্টিত। বড় বড় চারিটী পুষ্করিণী বাড়ীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল; দুইটী অন্দরমহলে ও দুইটী বহির্বাটীর দিকে। অন্দরমহলে যে দুইটী পুষ্করিণী তাহার একটীর নাম "মাথাঘসা" ও অপরটীর নাম "কাপড়-ধোয়া!" মাথাঘসা পুকুর নামেই পাঠকগণ, সন্ন্যাসী জিউর সেবাদাসীগণের মাথাঘসা ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া লইবেন; আর কাপড়ধোয়া তাহাও প্রায় সেই ব্যপদেশে,—অর্থাৎ শ্রীমতীগণের জলকেলি হইত। বহির্ভাগের পুষ্করিণী দুইটীর মধ্যে একটী পানীয় ও অপরটী সৈন্যসামন্তগণের স্নানের জন্য সতর্কভাবে সংরক্ষিত ছিল।

দারোগা বাবুর সহিত আমরা বন্দুকাদি লইয়া সতর্ক এবং সভয় হৃদয়ে, প্রতি পদক্ষেপেই ভীষণ ব্যাঘ্র গর্জ্জন কি আক্রমণ আশঙ্কা গণিতে গণিতে, ধীরমন্থরে বাড়ীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! বাঘ ত দূরের কথা, একটী শৃগালের সহিতও শুভ দর্শন হইল না,—প্রাণীর মধ্যে ভূরি ভূরি চর্ম্মচটিকার উৎপীড়ন ও দুর্গন্ধে স্থানটী অতিষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তবে কি না সখের প্রাণ, আর

পুরাতত্ত্বের একটা নূতন আবছায়া সবে মাত্র প্রাণে প্রবেশ করিয়াছে, তাই বাড়ীটী তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়া দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। বাড়ীটীর দ্বিতলে উঠিবার কাষ্ঠনির্ম্মিত অতিশয় জীর্ণ সিঁড়ী ছিল, তাহা নির্ভর করিয়া দোতালায় উঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এদিকে দারোগা বাবু ও আমার বন্ধু নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু আমি একরোখা লোক—কিছুতেই দোতালায় না উঠিয়া ছাড়িব না, ঐ ভগ্ন সিঁড়ী আশ্রয় করিয়াই আমাকে উপরে উঠিতে হইবে।

তখন আমার শরীর বিলক্ষণ পাতলা এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত ছিল, সুতরাং ঐ ভগ্নসিঁড়ী আশ্রয় করিয়াই কোন প্রকারে দ্বিতলে আরোহণ করিলাম। একেবারে যে অক্ষত শরীরে উঠিয়াছিলাম; পাঠকগণ তাহা মনে ভাবিবেন না।

উপরে উঠিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম এবং মনে ভাবিলাম এ কি দেখিতেছি! বাড়ীটীর বহির্ভাগের বর্ণনা পাঠকগণ যেরূপ শুনিলেন উপরের অবস্থা কিন্তু তদ্রূপ কিছুই নহে। দেখিলে বোধ হয় বাড়ীতে লোকজন ছিল, এবং তাহারা অল্প দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। সেই সতরঞ্জি, তদুপরে চাদর, দেওয়ালে প্রাচীন সময়ের কয়েকটী দেওয়ালগিরি; স্থানে স্থানে ছোট কুঠরিতে কাঠের পিলসুজ ইত্যাদি সবই সজ্জিত রহিয়াছে। বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম খুজিয়া পাইলাম না,—কেবল মানুষ। গৃহের আসবাব লোয়াজিমা সবই ধূলি ধূসরিত এবং চর্ম্মচটিকার মলমূত্রে কলঙ্কিত! এ দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা সংসার-অনিত্যতার ভাব জাগিয়া

উঠিল। হায় না জানি একদিন এইখানে কত কি ছিল, আজ সবই ফুরাইয়া গিয়াছে! হায় কাল তুমিই ধন্য!—

"এইত কালের গতি, এইত নিয়তি
এইত মানবদেহে পরিণাম ফল,—
কাল রাজ-সিংহাসনে, ধরণীর পতি।
আজ কমণ্ডলু আর অজিন সম্বল।"

এইক্ষণ আমাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে কিন্তু যে উদ্যমে উপরে উঠিয়াছিলাম সে উদ্যম এখন আর নাই। মানব প্রকৃতিরই এই কি একটা রহস্যময় গভীর প্রহেলিকা তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যে উদ্যমে তুমি দুবারোহ উন্নত গিরিশৃঙ্গে শত পাষাণ-স্তর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে চলিয়া যাও, ফিরিয়া আসিবার সময় তোমারও তখন আর সে উদ্যম থাকে না, হয়ত তখন তুমি পরের স্কন্ধভার হইবে আর না হয় তুমি পদস্খলিত হইয়া গভীর হইতে গভীরতর গহ্বরে নিপতিত হইবে।

এখন আর আমার নীচে নামিতে সাহস হয় না, নামিবার উপায়ও আর কিছু দেখিতেছি না। সঙ্গীদিগকে বলিলাম "আমায় নামাও" তাহারা বুদ্ধিতে আর কিছু যোগাইতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উপদেশ করিলেন "ঐ সিঁড়ী দিয়াই নামুন।" আমার আত্মারাম একটু গরম হইয়া উঠিলেন; রকম বুঝিয়া দারোগা বাবু বাঁশ আনাইবার জন্য কয়েকজন লোক পাঠাইলেন। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় নীরব থাকিয়া মাহুতকে "চারিজামা" খুলিয়া দড়ী উপরে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলাম। দড়ী-

প্রাপ্তি মাত্র আমি নিজে ক্ষিপ্রকরে ঐ বারেন্দার স্তম্ভে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া সন্তর্পণে ঝুলিয়া পড়িলাম। তখন সকলে শশব্যস্তে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক সশরীরে দৌড়িয়া আমাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আমি ত আর পাকা কাঁটালটি নই, সজীব প্রাণী। তাঁহাদিগের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেই লম্ফ দিয়া নিম্নে অবতীর্ণ হইলাম। "বাহবাটা" তাঁদের মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ নিঃসারিত হইয়া বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া রক্ষা পাইলাম এবং নীচের প্রকোষ্ঠগুলি পুনরায় ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। দেখিতে পাইলাম অন্দরমহলের এক প্রান্তে, নীচের দিকে এক বৃহৎ সুড়ঙ্গ পথ দেখা যাইতেছে, একটু অগ্রসর হইলাম কিন্তু ভয়ানক অন্ধকার, আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। হায়! কেন অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম না, সুযোগ পাইয়াও কেন ছাড়িয়া দিলাম, সেজন্য এখন মনে বড়ই অনুতাপ হয়।

রাস্তায় চলিতে চলিতে উপরের তালায় যাহা দেখিয়াছিলাম সঙ্গীদের নিকট আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তখন তাঁহারা উহা দেখিলেন না বলিয়া বড়ই অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নানারূপ কথাবার্ত্তায় তাম্বুতে ফিরিলাম। রাত্রিতে সন্ন্যাসীর বাড়ীর বিষয়ই আলোচনা এবং ধ্যান ও ধারণা হইয়া দাঁড়াইল। পরদিন আহারাদি সমাপন করিয়া অনুমান বেলা তিনটার সময় গাবতলী অভিমুখে চলিলাম। আমরা জঙ্গলের দশ আনা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তখন এক মাহুত আর এক মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই ওটা কিসের শব্দ শোনা যায় রে?" কথাটা শুনিয়া



রজ্জু অবলম্বনে ভগ্নবাড়ী হইতে অবতরণ —৩০ পৃঃ

আমিও সাগ্রহে কাণ পাতিয়া শুনিলাম—"হুম্-হুম্" এক গভীর শব্দ। অনুমান হইল বহুদূর হইতে এ শব্দটা আসিতেছে। রাত্রি তখন সাতটা কি সাড়ে সাতটা। গাঢ় অন্ধকার, সম্মুখের হাতীও দেখা যাইতেছে না, সুতরাং ঐ শব্দটী আমোদজনক ত বোধ হইলই না বরং উহা বিলক্ষণ ভীতি সঞ্চার করিল। মাহুতকে দ্রুত হাতী চালাইতে আদেশ করিলাম, হাতীও খুব ছুটিল এবং শব্দটীও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। শব্দটী যে কিসের তখন তাহা আমরা কেহই স্থির করিতে পারিলাম না, দেখিতে দেখিতে গাবতলী পৌঁছিলাম। সে দিবস তথায় আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম এবং সেখান হইতে স্পষ্ট শব্দ লক্ষ্য করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কোন ব্যাঘ্রকুলধুরন্ধর মহোদয়েরই গুরুগভীর-ভৈরব গর্জ্জন। পরদিন প্রত্যূষে আপনাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরমুখো বাঙ্গালী,—ব্যাঘ্রশব্দে পরিতুষ্ট হইয়া সশরীরে মুক্তাগাছা প্রাসাদে ফিরিলেন।

———o———

পঞ্চম প্রস্তাব।

গাবতলী শিবির—ময়মনসিংহ।

"Perseverance, dear my Lord,
Keeps honour bright.—*Sh.*

Wards Institutionএ থাকা কালে অন্য কোন বিদ্যাশিক্ষা হউক আর নাই হউক, আমার ও আমার কয়েকজন সহচরের ঘোড়ায় চড়াটা, বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়াছিল। তথায় অবস্থান কালে আমার বড় বড় কতকগুলি hound কুকুর ছিল। অবসর মত, সময়ে সময়ে ঐ কুকুরগুলি লইয়া দম্‌দমার মাঠে Pig-stickingএ যাইতাম। শূকরের পিছনে পিছনে ঘোড়া দৌড়াইতে আমাদের বিলক্ষণ সখ ছিল। সময় ও সুযোগ পাইলেই আমার ঐ বৃত্তিটী বাসনা পূরণের জন্য আমাকে সজাগ করিয়া দিত। Pig-sticking বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সখ ছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বন্দুক আমার "দুই চক্ষের বিষ" এবং যাঁহারা বন্দুক ব্যবহার করিতেন বা কাছে রাখিতেন তাঁহারাও আমার চক্ষুশূল ছিলেন।

এই সংসারে যাবতীয় কার্য্যই সাধনার অধীন। আধ্যাত্মিক জীবন হইতে কৃষিজীবীর জীবন পর্য্যন্ত সকলই সাধনা

সাপেক্ষ। পৃথিবীতে যাহা হইয়াছে,—মানুষ যাহা করিয়াছে, —মনপ্রাণে সাধনা করিলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, এমত আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমিও বন্দুকসাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার পাঠকগণের উপরেই অর্পণ করিলাম।

এবার বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভালরূপে বন্দুকের "নিশানা" অভ্যাস করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলাম। কারণ, গত দুই বৎসরে, শিকারের সকল কষ্টই সহ্য করিয়াছি,—শিকার প্রচুর দেখিয়াছি, বারুদ ও গুলি বহুতর যোগাইয়াছি, কিন্তু হায় অদৃষ্ট! কেবল ফলভোগেই বঞ্চিত। ফুল আহরণ করিয়াছি সত্য, মাল্যরচনা অভ্যাস করি নাই। কাজেই ইচ্ছা হইল শিকারী হইব,—সঙ্গীদের ন্যায় শিকারী হইব। তাই বা কেন? তাদের চাইতে ভাল শিকারী হইব। এইরূপ একটা গুপ্তবাসনা হৃদয়ের সুপ্ত কক্ষে যেন স্বপ্নের মত নিঝুমে জাগিয়া উঠিল। অবশ্য এরূপ সঙ্কল্প একরূপ মন্দ নয়। এদিকে কিন্তু শর্ম্মা আমি,—কি করিয়া বন্দুক ধরিতে হয়, চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয় কি না, হইলেই বা কোন্ চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইবে, তাহাই আমার আদৌ জ্ঞান নাই, অথচ কাহাকেও ওস্তাদ স্বীকার না করিয়া গুরুর উপদেশ ব্যতীতই পণ্ডিত হইবার ইচ্ছা।

এইভাবে সঙ্কল্প স্থির করিয়া, মনে মনে একটা পাকা মুশাবিদা ঠাওরাইয়া, কৌশল, চালাকী এবং আলাপচ্ছলে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি রাম শ্যামের নিকট হইতে যেন তেন প্রকারে জানিয়া লইতাম এবং সকালে বিকালে ঐ একমাত্র কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতাম। "নিশানার" জন্য প্রত্যহ অন্যূন

পঞ্চাশ-ষাটটি "কার্টুস" খরচ করা হইত। বাড়ীর প্রাচীন দেওয়াল যাহা দীর্ঘ দিন ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপের সাক্ষীস্বরূপ অক্ষতশরীরে দণ্ডায়মান ছিল, তাহা "টারগেটে" পরিণত হইয়া ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইতে লাগিল। হায়! কত মৃণ্ময় কলসী যে আমার লক্ষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সুন্দরী যুবতীগণের কোমল বাহুলতার আলিঙ্গন ও কটিদেশচ্যুত হইয়া মাটির কলসী, মাটিতে বিলীন হইয়া গেল তাহার সংখ্যা নাই।

গুরু উপদেশ ভিন্ন বন্দুক অভ্যাস করিলাম সত্য, কিন্তু উহা ঠিক হইল কিনা তৎসময়ে তাহা বুঝিতে পারি নাই। লক্ষ্যভেদ করিতে পারি, ইহাতেই প্রচুর আনন্দ; কিন্তু অবশেষে কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দেখি "বিচ্ মোল্লায়ই গলদ্" তাহা বুঝেই বা কে এবং বুঝাই বা কাহাকে? এক নম্বরের ভুল ছিল বন্দুক ধরায়,—বন্দুক ধরার নিয়ম, বন্দুকের কুন্দা বক্ষের উপর রাখিতে হয় কিন্তু আমার ছিল তাহার বিপরীত,—আমার বন্দুকের কুন্দা দক্ষিণ বাহুতে সংবদ্ধ থাকিত। দুই নম্বরের ভুল, নিশানা রীতিমত না করিয়া, কেবল নলের মুখের দিকে (Muzzle) দৃষ্টি রাখিয়া গুলি ছুঁড়িতাম। তিন নম্বরের ভুল বাম চক্ষু না বুজিয়া দক্ষিণ চক্ষু বুজিতাম, ইহার পর আর এক বৃহৎ দোষ ঘটিল, লক্ষ্য স্থির না হইলে আর বন্দুক উঠিত না।

বন্দুকের বর্ণপরিচয়-সূত্র ধরিয়া যে তত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম তদবলম্বনেই উৎসাহের সহিত অভ্যাস করিতে লাগিলাম এবং গুলির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া একজন শিকারী হইতে পারিয়াছি বলিয়া, মনে বড়ই একটা অনাহূত আনন্দের ভাব জাগিয়া

উঠিল। এইরূপে কয়েক মাস টার্গেট্ অভ্যাস, এবং ঘুঘু ইত্যাদির প্রতি অজস্র গুলিবর্ষণ করিতে করিতে ক্রমেই শিকারের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। এখন বন্দুক ধরিতে পারি, ছুড়িতে পারি, এবং সময়ে সময়ে লক্ষ্যভেদও করিতে পারি, এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি। একেইত যৎসামান্য ইচ্ছার বর্দ্ধিষ্ণু বেগ অক্ষমতা সত্ত্বেই সংবরণ করা কঠিন, তাহাতে আবার আমার একটু ক্ষমতা জন্মিয়াছে, সুযোগ এবং অবস্থার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, এমত অবস্থায় যে প্রবৃত্তি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? বর্ষাকাল, "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা," মেঘমালা চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, বকগুলি স্থির বায়ুকোলে গ্রথিত শ্বেতপুষ্পমাল্যবৎ এখানে সেখানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া ঝির ঝির ভাবে কখনও বা মূষলধারায় বারি বর্ষণ হইতেছে। কোথাও বাহির হইবার সাধ্য নাই, পথ ঘাট কর্দ্দমিত, নালা বিল জলে পরিপূর্ণ। হাত পা বন্ধ করিয়া ঘরে "জুজু" হইয়া বসিয়া আছি, আর বন্ধুগণের সহিত ইয়ার্কি ও গালগল্পে মজলিস জমকাইয়া একরূপে সময় কাটাইতেছি; কিন্তু মনত তাহাতে বুঝে না। যে নূতন ধুয়ায় সুর ধরিয়াছি তাহার সাধনা ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না অর্থাৎ বন্দুকের বিশ্রাম যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহারই মধ্যে যে টুকু সুযোগ পাইতাম, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া এদিক ওদিক দুই চারি পা শিকার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত ঋতুও চমক দেখাইয়া চলিয়া গেল,—সুখের শীতকাল

ঝঙ্কার দিয়া উত্তরবাহী হিম-বায়ু সঞ্চালনে আমার উৎসাহ উদ্যম উদ্বেলিত করিয়া আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল। দেহে নব-জীবন সঞ্চারিত হইল, আনন্দে মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এখন আর অন্য আলাপ, অন্য কথা নাই, কেবল শিকারেরই জল্পনা কল্পনা। এবার শিকারপার্টিতে কে কে যোগ দিবেন, কোথায় যাইতে হইবে, গত বৎসর যেখানে গিয়াছিলাম, সেখানে যাওয়া হইবে কি না ইত্যাদি বহু বিষয় আন্দোলনের পর "রাঙ্গামাটিয়া" নামক স্থানে শিকারে যাওয়াই স্থিরীকৃত হইল। বসন্ত ঋতুর প্রথম ভাগ, এই রাঙ্গামাটিয়া বনে শিকারপ্রাপ্তির প্রশস্ত কাল, কারণ ঐ সময়ের পূর্ব্বে তথাকার নিবিড় "টাঙ্গর" (Reed) বনগুলি পোড়ান যায় না, বন না পোড়াইলে শিকার মিলাও দুঃসাধ্য ব্যাপার, অতএব এই শীত ঋতুটাকে যুগান্তের মত অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

সময় কাহারও হাত ধরা নহে। সুখেরই হউক, আর দুঃখেরই হউক, সে কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে মাঘের পনর দিন অতীত হইয়া গেল, বসন্তের শুভাগমন হইল। কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমরনিকর গুঞ্জরিয়া উঠিল, পিকবধূ, ললিত মধুর পঞ্চমে তান ধরিল; সে তানে মুগ্ধ হইয়া দয়েল, খঞ্জন, শ্যামা প্রভৃতি নৃত্যপরায়ণ বিহগনিকর মধুর বসন্তে তাহাদিগের নৃত্যলীলায় মধুরতা জ্ঞাপন করিল। বিপিনে কুরঙ্গকুল নানারঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া সুরভি পবনে মাতিয়া উঠিল। শ্বাপদকুল বসন্তের এই সুখ বিচার না করিয়া এ সুযোগে তাহাদিগের তৃষিত বৃত্তি চরিতার্থ করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

আমাদের Bag and Baggage প্রস্তুত;—সকলেই আমোদ উৎসবে মত্ত; এমন সময় জনৈক ব্যক্তি বলিল গন্তব্য স্থানে অর্থাৎ "রাঙ্গামাটিয়ায় গরুর গাড়ী যাইবে না। পথ ঘাট নাই।" এই কথা শুনিবামাত্রই সকলের হাত পা অবশ হইয়া পড়িল। উদ্যম ও আশাস্রোতে বাধা পড়িলে, সাধারণতঃ মনের গতি যেরূপ হয়, পাঠকগণ অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারেন। যাহাই হউক, সকলের মনের গতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, অবশ্য আমার মন ঠিক সেরূপ হয় নাই। আমার হৃদয়ে তখনও আশার একটি ক্ষীণ রেখা বিদ্যুতের মত লুকোচুরি খেলিতেছিল। আমি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তথায় যাইতে প্রতিবন্ধক কি?" উত্তরে পাইলাম "পথ ঘাট আদৌ নাই, মাঠ ক্ষেত ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, ক্ষেত্রের আইল, গাড়ী যাইবার বাধা জন্মায় এবং জঙ্গলের মধ্যস্থিত পথ এত সঙ্কীর্ণ যে গাড়ী দূরের কথা, দুটি মানুষের পাশাপাশি হইয়া যাওয়াই দুঃসাধ্য।" ইত্যাদি। আমি একটু ইতস্ততঃ ভাবিয়া বলিলাম "আচ্ছা কুচ পরয়া নেই, খান কত দা, কোদালি সঙ্গে লও, সম্মুখে যে গাছ পালা পড়িবে তাহা কাটিয়া পথ করিয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া দলস্থ সকলের মলিন মুখশ্রীতে তাড়িতের মত অকস্মাৎ একটা প্রফুল্লতা জাগিয়া উঠিল; সকলে উচ্চকণ্ঠে Hear, Hear শব্দে গৃহটি তোলপাড় করিয়া তুলিল;—তখন তাহাদের সকলের মুখের কালিমা এক যোগ হইয়া, যে ব্যক্তি পথ বন্ধের খবর দিয়াছিল, তাহার মুখে সংলগ্ন হইল, সে যেন কিম্ভুত কিমাকার হইয়া পড়িল!—দেখিতে দেখিতে যাত্রার

দিন উপস্থিত, জিনিস পত্রাদি গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া রওয়ানা করা হইল।

আজ রাত্রিশেষে রওয়ানা হইতে হইবে। মাসের কোন্ তারিখ ঠিক হলপ করিয়া বলিতে পারি না, তবে স্মৃতির সাহায্যে যতটা মনে পড়ে, বোধ হয় মাসের শেষেই হইবে। প্রাণে বড় ব্যগ্রতা,—ভাল করিয়া নিদ্রা হইতেছে না, টং টং করিয়া মেকেইব ঘড়ীতে দুইবার শব্দ হইল,—একটু তন্দ্রার আবেশে ছিলাম, মনে ভাবিলাম বুঝি আমার শ্রুতির পূর্ব্বে ঘড়ী আরো দুইবার টং টং করিয়াছে। প্রাণের ব্যস্ততায় ঐরূপই হইয়া থাকে, আমি শয্যা হইতে উঠিয়া ঘড়ীর দিকে চাহিলাম,—ঘুমের চক্ষে চাহিলাম, দেখিলাম ৪টা,—ইহা আগ্রহের বিকার মাত্র, বস্তুতঃ ২টাই বাজিয়াছে। এইরূপ অনেক বার উঠা বসা করিতে করিতে রাত্রি ৫টা বাজিল। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। আদেশ মত হস্তি-সকল সজ্জিত ছিল, দলস্থ সকলে প্রস্তুত, হস্তীতে আরোহণ করিলাম, সঙ্গে দুইজন দেশীয় শিকারী। কুইনি ও বিবি নাম্নী কুকুরীদ্বয়ও আমাদের সঙ্গে চলিল। এবার পার্টিতে ১২টী হাতী ছিল।

শেষ রাত্রি, দারুণ শীত, আমরা প্রত্যেকে পুরু পশমি বস্ত্রে আবৃত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করিলাম;—তখনও রজনীর গাঢ় কুহেলিকা বিদূরিত হয় নাই, চতুর্দ্দিকস্থ গাছ-পালা গ্রাম প্রভৃতি কিছুই স্পষ্ট দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। নানারূপ রহস্য আলাপে আস্তে আস্তে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; দেখিতে দেখিতে সুখময়ী ঊষা পূর্ব্বদিকে

একখানা লালবনাত বিছাইয়া রাখিল ;—তাহার উপর দিয়া দিবাকর আস্তে আস্তে ধীর পদবিক্ষেপে যেন নিজ কর্ত্তব্য পূরণ মানসে দরবার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাখিকুল প্রভাত রাগিণীতে কলমুখরিত কণ্ঠে তাহার স্তুতিগান আরম্ভ করিল, জীবকোলাহল প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বন হইতে বনান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, মাঠ হইতে মাঠান্তরে যুগপৎ ছাইয়া পড়িল। প্রাতঃসমীরণে পাদপশ্রেণী মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল। আমাদিগের মনও আনন্দে নাচিয়া উঠিল, সঙ্গী বিহ্বলহৃদয়ে গান ধরিলেন—

"অয়ি সুখময়ী ঊষে কে তোমারে নিরমিল"

তালে তালে হাতীগুলি হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। পত্রে পত্রে শিশির বিন্দু মুক্তাবলির মত শোভা পাইতেছিল, পাপী মানব আমরা, আমাদিগের গাত্রসংঘর্ষণে অশ্রুর মত গলিয়া পড়িয়া আমাদিগের বস্ত্র ভিজাইয়া দিল। প্রভাতের মনোহারী দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ; নানারূপ গল্প আরম্ভ হইল। সঙ্গী শিকারীদ্বয় কোন্ দিন কাহার সহিত কি শিকার করিয়াছিলেন সেই সকল কেচ্ছা জুড়িয়া দিলেন,—এক জন বলিল, "আমি অমুক বৎসর অমুক স্থানে ১৪। হাত একটা শেলাবাঘ মারিয়াছিলাম" অন্য আর একজন "আমিও অমুক স্থানে এক দিন ২০টা গাউজ মারিয়াছিলাম" ; ইত্যাদি, নানারূপ বেওয়ারিস গল্প চলিতে লাগিল। আমরা অবশ্য সে কথাগুলি যে কাণ পাতিয়া না শুনিতেছিলাম এমত নহে, তবে বিশ্বাস করা না করাটা আমাদিগেরই একৃতিয়ার।

এক টানে "রাঙ্গামাটিয়া" যাওয়া কষ্টকর হইবে, তাই পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত ছিল যে পথিমধ্যে পুঁটিজানা নামক স্থানে রায়দের বাটীতে মধ্যাহ্নের ব্যাপার সমাধা করিয়া তৎপরে ক্যাম্পে যাওয়া হইবে। বেলা ৮॥ টার পর আমরা রায় মহাশয়দের বাটী° পৌঁছিলাম, তাঁহাদিগের আগ্রহ যত্ন এবং আলাপ আপ্যায়িতে যৎপরোনাস্তি বাধিত হইয়া আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় পথবাহী হইলাম। অপরাহ্ণ ৫টার সময় রাঙ্গামাটিয়া ক্যাম্পে পৌঁছিলাম। তথায় সমস্তই সজ্জিত রহিয়াছিল, সামান্য বিশ্রাম অন্তে, একটু পা'চালি করিতে বাহির হইলাম, কুকুরীদ্বয় আমার সঙ্গে চলিল। যেখানে আমাদের ক্যাম্প খাটান হইয়াছিল, সেই স্থানটি বড়ই মনোরম। সম্মুখে প্রকাণ্ড এক দীঘি, স্ফটিকস্বচ্ছ নির্ম্মল জল থৈ-থৈ করিয়া মৃদু মৃদু নাচিতেছে, দীঘির চারি পার্শ্বে আম, কাঁটাল, জাম প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত দেখিয়া স্পষ্ট প্রমাণ হয়, পূর্ব্বে এখানে লোকের বসতি ছিল। এই সকল বৃক্ষ তাহাদের সাধের সাজান বাগান। হায়! আজ তাহারা সব কোথায়! বলা বাহুল্য, এই "রাঙ্গামাটিয়া" মধুপুর গড়ের প্রান্তস্থিত একটি গ্রাম।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় মধুপুরের গড় সকলের নিকটই পরিচিত ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিকারপ্রিয়ব্যক্তি মাত্রেই ময়মনসিংহ কি ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টে আসিলে এই বন সন্দর্শন না করিয়া আর ফিরিতে পারেন না। শ্বেতাঙ্গ পুরুষই হউন কি বাবু ভায়াদের মধ্যে যে কেহ হউন, যাঁহাদিগের শ্লথহৃদয়ে এই পুরুষোপযোগী বিক্রম ও উদ্যম জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে এই বনে

কিছু দিন শিকার অনুসন্ধান করিতে হইবেই হইবে। বিখ্যাত শিকারী সিমসন সাহেব তাঁহার জীবনের উৎকৃষ্ট সময় এই বনমধ্যেই শিকার উদ্দেশ্যে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহা তৎকৃত পুস্তকেই লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং আমার প্রথম প্রবৃত্তি, উদ্যম ও উৎসাহ যে মধুপুরের বনে জড়িত থাকিবে ও তাহার চতুষ্পদ অধিবাসিগণের সহিত গ্রথিত রহিবে তাহাতে আর বিস্ময় কি !

পর দিন প্রাতে শিকারে বাহির হওয়া গেল। মধুপুরের বনটি এমন প্রশস্ত ও বিস্তৃত এবং নিবিড় তরু-তৃণাচ্ছন্ন যে অপ-রিচিত ব্যক্তির পক্ষে পথপ্রদর্শকের সাহায্য ব্যতীত আগম-নির্গম একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। একজন প্রাচীন মুসলমান পথপ্রদর্শক আমাদিগের সঙ্গে ছিল। সে ব্যক্তি কেবল পথ-প্রদর্শক নহে—নিজে একজন শিকারী, তাছাড়া নানা প্রকার ফকিরালীও তাহার জানা ছিল। হাতে সর্ব্বদাই "তজ্‌বিহ্" অর্থাৎ 'জপমালা' থাকিত। অন্যান্য গুণগ্রামও তাহার যথেষ্ট। মোটের উপর এ লোকটীকে এক প্রকার "সবজান্তা" বলিলেই হয়। আমরা তাহাকে ফরাজী সাহেব বলিয়াই ডাকিতাম। আমার সঙ্গীয় বাবুটি অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ ঊষার পূর্ব্বেই নিদ্রা হইতে উঠিয়া, তাম্বুর বাহিরে এমত গলাবাজি আরম্ভ করিলেন যে আর কাহার সাধ্য শয্যায় থাকে, সুতরাং বাহিরে আসিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তর সামান্য একটু জলযোগ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে বনাভিমুখে চলিলাম। বলা বাহুল্য এবার আমি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছি—আর আমি শিক্ষানবিসীতে নই—স্বয়ং আমিও একজন শিকারী। সঙ্গে ৮টি হাতী চলিল,

তিনটিতে চারিজামা উঠিল, একটি আমার নিমিত্ত, দ্বিতীয়টি বাবুর, তৃতীয়টিতে শিকারীদ্বয়। আমি একটি মেনিতে (young female) শোয়ার হইলাম। অপরাপর হস্তীতে আর সকলে এবং আহার্য্য পানীয় প্রভৃতি চলিল। যাইতে যাইতে ফরাজীসাহেবের 'সহিত অনেক ফক্কিকারী করা গেল ;— সময়ান্তরে সে সব কথা বলা যাইবে।

ক্যাম্প হইতে প্রায় ২ মাইল অগ্রসর হইয়া "ছিট" বনের (বনের সীমার) নিকট পৌঁছিলাম। "Now is the tug of war" ঘোর সমর-সঙ্কট!—বৃহৎ বনের বহির্ভাগ এমন ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ যে পথ করিয়া হস্তী প্রবেশ করান একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার—মাহুতেরা অনবরত মারমার ধরধর 'বোল' দিয়া অঙ্কুশ মারিতে লাগিল, হাতী বেচারীরাও প্রাণপণে সেই কণ্টকপূর্ণ ছিটবনগুলিকে পদদলিত করিয়া রক্তাক্তদেহে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। এ সময়টা হস্তিপৃষ্ঠে থাকা একরূপ অসাধ্য! একেত হাতীর প্রকাণ্ড স্থূল দেহের ঝুঁকি, তদুপরি কণ্টকপূর্ণ লতা ও কাঁটাগাছের উৎপীড়ন, গায়ের কোট স্থানে স্থানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কাঁটায় বাধিয়া মাথার টুপী কাঁটাগাছে একবার ঝুলিয়াও ছিল। ভয়ানক ব্যাপার! অবশেষে ফকির সাহেবের উপদেশ অনুসারে ঘুরিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং কিছুদূর যাইয়া একটা প্রশস্ত পথ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া রক্ষা পাইলাম।

আমরা ঐ পথ ধরিয়া অচিরাৎ বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাদের সাধনভূমি অধিক দূরে নয় শুনিয়া, এক দিকে যেমন প্রাণে আনন্দ ;—এত কষ্ট করিয়া এত উদ্যোগ উদ্যমের পর

শিকারভূমি দর্শন করিব বলিয়া; আর এক দিকে তেমন নৈরাশ্য;—শিকার দেখিলে বন্দুক উঠিবে কি না, শিকার করিতে পারিব কি না ভাবিয়া।

পরীক্ষা একটি ভয়ানক বিষয়, পরীক্ষা শব্দেই পরীক্ষার্থী ব্যক্তির হৃৎকম্প হয়। কিন্তু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পরীক্ষা আমাদের শিক্ষার উপায় এবং উন্নতির সহায়। এই সংসারে নানা শ্রেণীর পরীক্ষা, এই পরীক্ষা দ্বারা আমরা কেবল বিদ্যা শিক্ষা পাইতেছি না, সাবধানতাও শিক্ষা পাইতেছি। ভৃত্য বাজারের পয়সার হিসাব প্রভুর নিকট দিতে হইবে বলিয়া সতর্ক হয়। মোহরের জমা খরচের পরীক্ষা আছে, বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সাবধানতা অবলম্বনে হিসাব প্রস্তুত করে। স্কুলের ছাত্র পরীক্ষার জন্য ভয়ে বিহ্বল হইয়া তদ্গতচিত্তে পাঠাভ্যাস করে। শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ কোনও প্রকাশ্য সভায় পরীক্ষার্থ আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মতালু বিদীর্ণ পূর্ব্বক নিজ মত সমর্থন জন্য চীৎকার করেন। আমারও এই প্রথম পরীক্ষার স্থল উপস্থিত; সুতরাং বিশেষ সতর্ক হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দুক ধরিতে হইল।

ভাবিতে ভাবিতে শিকার ভূমিতে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে হাতী দাঁড় করিয়া বন্দুকে "কার্টুস" পূরিয়া লইলাম, শিকারীদ্বয় তাহাদিগের বন্দুক বোঝাই করিল। তৎপর লাইন ধরিয়া হাতী কয়টী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বেলা তখন ৮॥টা—শীতের বেলা, তখনও ভাল করিয়া রৌদ্র উঠে নাই—ঘাসের উপর শিশির শুকায় নাই—বড় সুন্দর

দৃশ্য! হরিণগুলি এমন সময়েই ঘাস, পলাশ ফুল, আমলকী প্রভৃতি বন্য ফল খাইতে চালার উপর আসিয়া থাকে, আমরাও হরিণ দেখিতে পাইলাম, দুই চারিটার উপর আমার বাবু বন্ধু ও শিকারীদ্বয় যে বন্দুক না চালাইলেন এমত নহে। কিন্তু ফলে "কাকস্যপরিবেদনা।" আমি বন্দুক ধরিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া হেবেনা চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করিতেছি কিন্তু বন্দুক তুলিয়া লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি না, কারণ, হরিণ যে দাঁড়ায় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার অভ্যাস, লক্ষ্য স্থির না হইলে বন্দুক উঠিবে না। এই ভাবে আরো কিছুকাল গেল, আমি একটি পলাশ বৃক্ষের সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতেছি, শাখার উপরে কপোতজাতীয় দুইটি বন্যপাখী সুখে রসালাপ করিতেছে, স্থির নয়নে তাই দেখিতেছি, দুই একটি ফুল ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ভূমিতে পতিত হইতেছে;—এমন সময় মাহুত অঙ্গস্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমায় ইঙ্গিত করিল। চকিতে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলাম একটি হরিণ (Hog deer) অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া ঝোপের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সুযোগ আর ছাড়ে কে? "বকৃসট্" ভরা বন্দুক তুলিয়া স্থিরভাবে হাতীটিকে দাঁড় করাইয়া ধীরস্থিরে বন্দুকের ঘোড়া তুলিলাম; খট্ করিয়া ঘোড়া পড়িল,—গুড়ুম করিয়া আওয়াজ বনভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের নালমুখে ক্ষণপ্রভার মত অগ্নি উদ্গীরণ হইল, পুরোভাগ ধূঁয়ায় আছন্ন হইয়া গেল, হায়! হরিণ পড়িল না। কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের একখানা পায়ে গুরুতররূপ আঘাত লাগায় দেখিতে পাইলাম হরিণ তিন পায়ে ভর করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে

ছুটিয়াছে, এবং রক্তস্রাব হইতেছে। হায়! যে রক্ত, জীবন-ধারণের প্রধান সহায়—সময়ে সেই রক্তই জীবনহন্তা হইয়া দাঁড়ায়। রক্তচিহ্ন অনুসরণ করিয়া হাতী অমনি পিছনে পিছনে ছুটিল, কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিতে পাইলাম সামান্য একটা ঘাসের ঝোপের ভিতর হরিণটি লুকাইয়া ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নিক্ষেপে অন্তিম যন্ত্রণার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদিগকে এতটা নিকটে দেখিয়াও পলায়নের চেষ্টা করিতেছে না, বরং কাতর ও সজল-নয়নে, ম্লানবদনে আমাদিগের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, সেই চাহনির ভাবার্থ আর কিছুই নয়; তোমরা আমার প্রতি এ জুলুম কর কেন? জঙ্গলের নিরীহ ক্ষুদ্র প্রাণী আমি, ফলটা মূলটা আহরণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া মনের আনন্দে উৎসাহে বনে বেড়াই, আমাকে বধ করিতে তোমাদের এত প্রয়াস, এত কষ্ট, এত ব্যয় কেন? মনে পড়িল কালিদাসের ঋষিকুমারগণের মুখের সেই কথাটি,—সংস্কৃতটি ঠিক আমার মনে আসিতেছে না;—মনিয়র উইলিয়ম সাহেবের অনুবাদ মনে পড়িল;—

Now heaven forbid this barbed shaft descent
Upon the fragile body of a fawn,
Like fire upon a heap of tender flowers!
Can they steel blots no meeter quarry find
Than the worm life blood of a harmless deer
Restore, great Prince, thy weapon to its quiver
More it becomes thy arms to shield the weak,
Than to bring anguish on the innocent.

"কিন্তু পাষাণে নাস্তি কর্দ্দম"—আমি তখন যে ব্যাধবৃত্তি

অবলম্বন করিয়াছি, যে কর্কশ কঠোর করকাস্বরে হৃদয়ের কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়াছি, তখন ঐ আর্ত্তনাদ, ঐ করুণ কাতর ভাবব্যক্তি আমার প্রাণ স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে কেন? জানি না, কেন একবার চক্ষু মুদিলাম, তৎক্ষণাৎই চক্ষু মেলিয়া দেখি মৃগ সেই ভাবেই আছে, বন্দুক উঠাইলাম, নিশানা ঠিক করিলাম, গুড়ুম গুড়ুম করিয়া উপর্য্যুপরি দুই নাল ছাড়িলাম, হরিণ ছট্ ফট্ করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চিরবিশ্রাম লাভ করিল। আনন্দ দেখে কে, আনন্দ রাখি কোথায়;—পাত্র কৈ? হায়! ধূলায় পড়িয়া আনন্দ গড়াইতে লাগিল। সঙ্গীয় বাবু বন্ধু অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; শিকারীদ্বয় আসিয়া বলিতে লাগিল, "আচ্ছা মারা, খুব মারা, কেউ নাই হোগা হুজুর কো জেইছে সখ আউর খেয়াল, জরুর হাত ঝাট্ হোজায়েগা।" এদিকে এইরূপ আনন্দ প্রকাশ ও বলাবলি ধুমাধুমি হইতেছে অন্য দিকে মাহুতগণ হরণটিকে গদির উপর তুলিয়া লইল। মনের আনন্দে বেলা ২টার সময় সকলে তাম্বুতে পৌঁছিলাম; আজকার শিকার এই পর্য্যন্ত

সমস্ত দিন শিকারের পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকায়, শ্রান্তি বোধ হইতেছিল; একটু বিশ্রাম অভিপ্রায়ে, তাম্বুর বাহিরে, "আরাম চৌকিতে" সজীব দেহখানা ঢালিয়া, হেভেনার ধুঁয়ায় কল্পনা সুন্দরীর আরতি করিতেছি, সান্ধ্য সমীরণ ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে, বন্য কুসুমের স্নিগ্ধ সৌরভে প্রকৃতি তন্দ্রালসা, বিহগনিচয়ের মধুর কলনিনাদে বনানি সম্মুঢ়া; এমন সময় আমাদের সেই পূর্ব্বোক্ত খুজি, "ফরাজী



হরিণ শিকার—৪৬ পৃঃ

মিঞা” “হুজুর” বলিয়া লম্বা হাতে সেলাম ঠুকিয়া স্তম্ভের ন্যায় সম্মুখে দাঁড়াইল। এ সময়ে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইলাম,—“বাবু তলব করিয়াছেন।” বাবু তখন কাবু হইয়া, তাঁবুর ভিতরে শয্যায় পড়িয়া “আই-ঢাই” করিতেছিলেন, খুজি মিঞার কণ্ঠস্বরে, তিনি ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাহিরে আসিয়া, মিঞার সহিত নানারূপ গল্প যুড়িয়া দিলেন; তন্মধ্যে প্রধান প্রসঙ্গ, বন্দুকের গুণজ্ঞান।

বাবু—ভাল, সাহেব, আজ ৬।৭টা হরিণ ও গার্উজের উপর গুলি করিলাম, কিন্তু ব্যাপারখানা কি দেখিলে ত? একটীও পড়িল না।

ফরাজী—কেবল গুলি করিলেই কি শিকার পড়ে মহাশয়? ইহার সাধনা আছে, হেকমত আছে। গুলি করার সময়, বারুদ ভরিবার সময় মন্ত্র পড়িয়া বন্দুক ছাড়িলে, তবে শিকার পড়িবে। বাবু! সাদা সিদেয় কোন কাজ হয় না। এ সবও চাই।

বাবু—ভাল, উনি (আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) যে হরিণ মারিলেন, ইঁহার বন্দুক কি মন্ত্রঃপূত করা হইয়াছিল? কই তা ত নয়!

ফরাজী—তা বাবু, এখন বলিলে বিশ্বাস করিবেন না; রাত্রি সজাগ থাকিয়া আমি ঐ বন্দুক মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছি, আপনারা সে খবর রাখেন না, তা না হ’লে কি আর এ হরিণ মারা পড়ে?

ফরাজীর কথা শুনিয়া আমি আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না, কৌতুকের মাত্রা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার আশায়

একটু গলা বাড়াইয়া বলিলাম, "হাঁ ঠিক, ফরাজী মিঞার খুব গুণ জ্ঞান, সাহেব, বাবুকে একটু তৈয়ার করিয়া দেও।"

বাবু—তবে, সাহেব, মেহেরবাণী করিয়া আমাকে এক আধটুকু শিখাইয়া দিন, আমি আপনাকে ওস্তাদ মানিলাম।

ফরাজী বোধ করি, বাবুর এই প্রার্থনায় এবং কাতরোক্তিতে আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, এবং গম্ভীরভাবে আবক্ষলম্বিত অর্দ্ধপক্ক শ্মশ্রুরাজি দলন করিতে করিতে বলিল, —"আচ্ছা বাবু, আজ আর সময় নাই, কাল ফজরে মন্ত্র বাৎলাইয়া দিব; কিন্তু আজ বন্দুক "জাগাইয়া" (বাক্সে কি গেলাপে না ঢাকিয়া) রাখিতে হইবে, তারপর কাল, লোকমানকে পাঁচ সিকার সিন্নি দিতে হইবে।" আমার ঐ সব আর বড় বেশি ভাল লাগিল না। আমি বলিলাম, "ভাল মিঞা, তোমার কোন কেচ্ছা (কাহিনী) আসে কি? খুজি বলিল, "হাঁ হুজুর, আসে বই কি?" খুজি যাহা বলিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম, আমার নিজ ভাষায় বর্ণন করিতেছি।

কেচ্ছা।

ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ রাজসংসার—দাস দাসী, লোক লস্কর, হাতী ঘোড়া প্রভৃতি রাজারাজড়ার যাহা থাকিতে হয়, কিছুরই অভাব নাই। রাজা ও রাণী সতত ধর্ম্মকর্ম্মে সদাব্রতে নিরত। কিন্তু হায়! ভগবান তাঁহাদের মনে সুখ শান্তির ব্যবস্থা করেন নাই; কারণ, সংসারের মমতা বন্ধন, যাহা লইয়া মানুষ জীবন সংগ্রামে সুখ দুঃখের অভিনয় করিয়া থাকে, যাহার করধৃত সূক্ষ্ম সূত্রের সঞ্চালনে আশায় বুক বাঁধিয়া, প্রাসাদে স্বর্ণপিঠ, উদ্যানে কামিনী মালতী স্থাপন

করে, এবং যাহার জন্য পরের রক্ত শোষণ করিয়া, নিজে শত বিড়ম্বনায় জীবন কাটাইয়াও এক অব্যক্ত সুখ সম্ভোগের আশায়, কুবেরের ভাণ্ডার পশ্চাতে রাখে; আর পরিপূর্ণতার দিকে অলক্ষিতে ফিরিয়া চায়, সেই সন্তানের অভাব। রাজা ও রাণী উভয়ে প্রৌঢ়াবস্থার প্রান্ত সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু পুত্র কন্যা কিছুই নাই; জন্মিবার আশাও তেমন নাই। বিস্তর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত দ্বারা দধি দুগ্ধ আহরণ এবং গোপকুল ধুরন্ধরগণ বিস্তর অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কেহ নিঃসন্তান অবস্থা হইতে রাজা ও রাণীকে মুক্ত করিতে পারে নাই। এমত সময় দৈববশতঃ তথায় এক ফকিরের আগমন হইল, গোপনে ফকির রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে একটি ফল দিয়া বলিয়া গেলেন,—"ভগবান্ সদয় হইয়াছেন, তোমাদের পাপক্ষয় হইয়াছে। এই ফলটি রাণীমাতাকে সেবন করাইলে, নিশ্চয়ই দুটি কন্যা রত্ন জন্মিবে। নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মহারাজ, ভক্তিপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন।" অবনতমস্তকে রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া এবং ফকিরকে যথাসম্ভব আপ্যায়িত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

হায়! এখনকার পাশ করা লম্বাচৌড়া উপাধিধারী ডাক্তারগণ! তোমাদের যদি সেই সময়ের ফকিরগণের মত ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক হতভাগ্য "অপুত্রক" পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইত, কিন্তু তা তোমাদের নাই; তোমাদের আছে, কেবল কতকগুলি ইংরেজী অক্ষরের আদ্যন্ত। আর যন্ত্র ইত্যাদির চালন-চূড়ান্ত।

ফকিরের ফলের গুণে, যথাসময়ে রাণী পরমা সুন্দরী দুইটী কন্যারত্ন প্রসব করিলেন—রাজ্যময় আনন্দ উৎসবের ঘটা পড়িয়া গেল। ওখানে মন্ত্রপাঠ, সেখানে শানাই টিকারা মুখরিত মৃদু নহবৎ। কোথাও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ফলাহার, "নৃত্যন্তি ভোজনৈ বিপ্রা।" কোথাও দরিদ্র কাঙ্গালীর হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকার! রাজ্যময় তুমুল কাণ্ড। রাজা ও রাণী সর্ব্বদা সহাস্যবদনে, বনে উপবনে, নৃত্যগীত সম্ভোগে সময় কাটাইতে লাগিলেন, এদিকে পরিচারিকাগণের যত্ন ও আদরে কন্যাযুগল

"যেন চন্দ্রকলা দিনে দিনে বাড়ে।"

রাণীর একটি পোষা কুক্কুরী ছিল। রাজা এবং রাণীর সযত্ন সোহাগে কুক্কুরী কতকটা পশুত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল। মানব-সমাজের সহিত ঐ কুক্কুরীর বড়ই ঘনিষ্ঠতা ছিল—সাধারণতঃ এমত হইয়াও থাকে। প্রাণী মাত্রেই "সংসর্গ-জাদোষগুণাভবন্তি।" বাস্তবিক কুক্কুরী এমত শিক্ষিতা হইয়াছিল যে, তাহার আচার ব্যবহারে সকলে চমৎকৃত হইত। রাজা এবং রাণীর অতিরিক্ত আদর যত্নই তাহার মূল কারণ। সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রভুর আদরের বস্তুটি, ভৃত্যগণ কি পারিষদগণ কর্ত্তৃক সমধিকরূপে সমাদৃত হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। বস্তুতঃ বলিতে কি, রাজা ও রাণীর বাৎসল্যের ষোল আনা ঐ কুক্কুরীই অধিকার করিয়াছিল। হঠাৎ কন্যাদ্বয় জন্মধারণ করায়, কুক্কুরীর প্রতি যত্নের যেন একটু লাঘব হইয়া গেল; অমনি তাহার পশু-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া, হিংসার উদ্রেক হইল, এবং সুযোগ

মত একদিন ঐ কন্যাদ্বয়কে লইয়া দূর দূরান্তর পর্ব্বতগুহায় পলাইয়া গেল। কিন্তু হায়! প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য লীলা! কন্যাদ্বয়ের রূপে মুগ্ধা হইয়া পুনরায় কুক্কুরী পশুবৃত্তি ভুলিয়া গেল; প্রাণে মমতা জাগিয়া উঠিল এবং কন্যাদ্বয়ের কোন অনিষ্ট না হয়, কোন অযত্ন না হয় ভাবিয়া এক গুহার ভিতরে আশ্রয় লইয়া, সন্তানবাৎসল্যে কন্যাদ্বয়কে লালনপালন করিতে লাগিল। কুটিল সংসার! অনেক সময় পশুতে যে মহত্ত্ব পাই, তাহা মানব-সমাজে খুঁজিয়া পাই না।

কুক্কুরী বিশেষ যত্নে কন্যাদ্বয়ের লালনপালন করিতেছে। রাজপ্রাসাদে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিয়া, আজীবন রাজ-ভোগ আস্বাদন করিয়া,—সুখাদ্য কুখাদ্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সময়ে সময়ে নগরে বাহির হইয়া, ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কন্যাদ্বয়কে খাওয়াইত, এবং তাহাদের সহিত নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও কৌতুকে সময় অতিবাহিত করিত। একদিন, কক্কুরী নগরে বহির্গতা হই-য়াছে, হঠাৎ দুইটি রাজপুত্র ঐ পর্ব্বতে শিকার করিতে আসিয়া ক্লান্তকলেবরে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া পিপা-সায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। ভৃত্যগণ জল অন্বেষণে ছুটিল; কিছু দূরে গিয়া তাহারা এক নির্ম্মলতোয়া ঝরণা দেখিতে পাইল। উহার নিকটে আসিয়া দেখিল যে, অপূর্ব্ব-দৃশ্যা দুই কুমারী ঝরণার পার্শ্বে ক্রীড়া করিতেছে, বনভূমি তাহাদের রূপে আলোকিত। ভৃত্যগণ জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া কুমারদ্বয়কে সেই কন্যাদ্বয়ের সংবাদ দিল। কুমারদ্বয় ঝরণার নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, বস্তুতঃই কন্যাদ্বয়

পরমা সুন্দরী। রূপে মুগ্ধ হইয়া কুমারদ্বয় বালিকাযুগল সঙ্গে লইয়া রাজপুরে প্রস্থান করিলেন। এবং সময়ে দুই ভ্রাতা দুই কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে মানবসমাজে পড়িয়া কুমারীদ্বয় আশ্চর্য্যরূপে মানব-প্রকৃতি ও শিক্ষাদীক্ষালাভে জনসমাজে প্রশংসনীয়া হইলেন। অজ্ঞাত-কুলশীলা কুমারীগণের পাণিগ্রহণে যাঁহারা একটু বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন, এখন রাণীদ্বয়ের আচার ব্যবহার ও দয়া মায়া দর্শনে তাঁহারাও নব-রাজবধূদ্বয়ের অনুগত হইয়া দাঁড়াইলেন।

কন্যাদ্বয় হারাইয়া, কুক্কুরী অস্থিরচিত্তে নানাস্থানে তাহাদের সন্ধান আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সে দেহলাবণ্য, সে শান্তভাব এখন আর কিছুই নাই, যেন ক্ষিপ্তা হইয়া উঠিয়াছে। ইহা প্রকৃতিরই লীলা। মানব! তোমার সাধের পোষিত শুক পাখীটি পিঞ্জর হইতে পালাইয়া গেলে, বোধ হয় দশ রাত্রেও তোমার সুনিদ্রা হয় না; পশুরও ঠিক তাই; দয়া মায়া, মমতা বন্ধন, প্রাণীমাত্রেরই বিধিপ্রদত্ত বিশ্বজনীন সামগ্রী। তবে মানুষের অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে, আর ইতর প্রাণীর সঙ্কোচিত ভাবে থাকে। কিন্তু বোধ হয় পশুর অনুরাগ যেন কেমন একগুঁয়ে,—একটানা রকমের। প্রভুর জন্য অনেক সময় অনেক পশুপক্ষী, যাহাদিগকে আমরা নিম্ন শ্রেণীতে স্থান দিই, তাহারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, আর মানুষ আমরা,—পরের জন্য সামান্য স্বার্থটুকুও ছাড়িতে পারি না। এস্থলে মানব-চরিত্র হইতে পশু-চরিত্র যেন শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করি।

কুক্কুরী নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে যে রাজপুরীতে

তাহার পালিত কন্যাদ্বয় অবস্থান করিতেছে, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। ব্যস্তমনে প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমত সময় বড় রাণী (বড় রাজকন্যা) উপর হইতে তাহাকে দেখিয়া, চিনিতে পারিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে "মা মা" বলিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন, আদরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং অতি যত্নের সহিত কুক্কুরীকে নিজ কক্ষের ভিতর লইয়া গিয়া যথারীতি আপ্যায়িত করিলেন; কিন্তু কুক্কুরী তাহাতেও শান্ত হইল না।

কারণ তাহার ছোট পালিতা কন্যার দর্শন নিমিত্ত প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। বড় রাণী কনিষ্ঠার স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন, তাই এ সময়ে তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন। কুক্কুরীর হৃদয়ে বাৎসল্যজনিত দর্শন পিপাসার প্রবল বেগ,— তাহার কথায় রোধ মানিবে কেন? ছুটিয়া ছোট রাণীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ছোট রাণীও তাহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, চিনিতে পারিলেন ও ভাবিলেন লোকে ইহাকে আমার "মা" বলিয়া জানিলে বড়ই লজ্জার কারণ হইবে, তাই প্রকাণ্ড এক খণ্ড ভগ্ন ইষ্টক কুক্কুরীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন, কুক্কুরী তাহাতেও পশ্চাৎপদ না হইয়া স্নেহবশে অগ্রসর হইতে লাগিল। কন্যা, এই ব্যবহারে অধিকতর রুষ্ট হইয়া আর এক খণ্ড ইষ্টক তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন। এবার আর কুক্কুরী সহ্য করিতে পারিল না;—"ঘেউ-ঘেউ" রবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বড় রাণীর দ্বারস্থা হইল, বড় রাণী তাহার এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত

হইয়া, তাহাকে কক্ষের ভিতর লইয়া গেলেন, এবং নিজ হস্তে নানারূপ ঔষধাদি দিয়া ও সেবাশুশ্রূষা করিয়া কৃতজ্ঞতা ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! কুক্কুরী বাঁচিল না, ঐ স্থলেই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া দিবাবসানে দেহত্যাগ করিল। রাণী সযত্নে সমাধির আশায়, বস্ত্রাবৃত করিয়া কুক্কুরীর মৃতদেহ, কক্ষান্তরের দ্বারদেশে রাখিয়া দিলেন; এবং মাতৃ-হারা সন্তানের মত শোকে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। দাস দাসীগণ শত চেষ্টায়ও তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারিল না।

রাণীর অসুস্থ সংবাদ শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমনকালে হঠাৎ কোন এক গুরুভার বস্তু তাঁহার গতি রোধ করিল, নিম্নে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন,—মণিমুক্তাখচিত কুক্করীর অবয়ববিশিষ্ট বৃহৎ একটি দ্রব্য ভূপতিত রহিয়াছে। বিস্ময়ে রাণীকে সম্মুখে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি?" প্রবাদই আছে, স্ত্রীজাতি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। রাণী উত্তর করিলেন,—"আমার পিতামাতা খেলার জন্য এই দ্রব্যটি পাঠাইয়াছেন।" শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং ভাবিলেন খেলার জন্য কন্যাকে যিনি, অসংখ্য মণিমুক্তা-খচিত এরূপ মূল্যবান্‌ বস্তু উপহার দিতে পারেন, তিনি সামান্য লোক নহেন, তিনি আমা হইতেও শত গুণে ঐশ্বর্য্যশালী। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"তোমাকে অরণ্য হইতে কুড়াইয়া আনিয়া—কেবল রূপ মোহেই মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছি। বস্তুতঃ কুল, শীল, মান ইত্যাদি কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। কিন্তু আজ সকল কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ দূর হইল।

এবং উদ্যোগ কর, সত্বরই আমি তোমার পিত্রালয়ে যাইব।" তুমি এযাবৎ সমস্ত গোপন রাখিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছ।" রাণী ভাবিয়াছিলেন, এ প্রস্তাব কথার কথা, অমনিই উড়িয়া যাইবে, কিন্তু রাজা যে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিয়দ্দিবস পরে; রাজা বলিলেন, "কালই তোমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে" রাণী বলিলেন, "আমি কালই যাইব, কিন্তু পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া আপনার এরূপ অনাহূত অবস্থায় তথায় প্রথম যাওয়া সঙ্গত নয়; আমি কাল যাইব, পরে সংবাদ দিলে, আপনি যাইবেন। অতএব, উদ্যোগ করিয়া দিন, আমি কালই যাত্রা করিব।"

ক্রমে অবসাদময়ী ঘোরা রজনী শেষ হইতে লাগিল, নিবিড় পত্রান্তরাল হইতে, একটি দুইটি করিয়া বন-বিহঙ্গের পক্ষান্দোলন সমুত্থিত হইতে লাগিল; এক তানে বিহগনিচয় প্রভাতী গাইল। দেখিতে দেখিতে যখন ঊষার রক্তিমচ্ছটা, পূর্ব্বাকাশ হইতে উকি মারিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, গৃহ প্রাঙ্গণে পড়িয়া, ঘাট, মাঠ, বাট ইত্যাদি প্রতিভাত করিল,—তখন লোক লস্কর সঙ্গে করিয়া রাণী শিবিকারোহণে, রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"—অবশেষে, আঁখি যে দিক ধায়, সেই দিকেই চলিলেন। চলিতে চলিতে বাহকগণ শ্রান্ত হইয়া পড়িল, চতুর্দ্দিকে ঘোর অরণ্য; কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; কেবল অরণ্যের পর অরণ্য। লোকজনদিগকে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিতে বলিয়া রাণী একাকিনী বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, কিয়দ্দূর

অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, এক বল্মীকস্তূপোপরি, মুখব্যাদানপূর্ব্বক প্রকাণ্ড এক অজগর পড়িয়া আছে; রাণী ভাবিলেন, স্বামীর মনে সন্দেহ এবং লোকজনের নিকট নিন্দা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, তাই সম্মুখীন হইয়া অজগর মুখে অঙ্গুলি দিলেন; দংশন দূরের কথা, অজগর আরও মুখব্যাদান করিল, রাণী মুখের ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া দেখিতে পাইলেন প্রকাণ্ড একটি কাঁটা আড়াআড়ি ভাবে তাহার গলদেশে আবদ্ধ হইয়া আছে। রাণী সযত্নে তাহা বাহির করিয়া ফেলিলেন, তখন অজগর যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইয়া, বড়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল;—এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুমি এখানে কেন?" রাণী বলিলেন, "আমার মৃত্যু কামনীয়, তুমি আমাকে গ্রাস কর" অজগর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার চিন্তা নাই; তোমার স্বামীকে লইয়া ২।৩ দিন পর তুমি এইখানে আসিও, তোমার পিতামাতা রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি সমস্তই দেখিতে পাইবে; ইহার অধিক যদি তুমি কিছু চাও, তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহাও আমি দিতে সক্ষম। কি আশ্চর্য্য! এই সংসারে হিংসাই যে জীবের প্রকৃতি, উপকৃত হইলে সেও এইরূপ কৃতজ্ঞ হয়; কিন্তু মানুষ আমরা,—কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া, উপকারী ব্যক্তিকে অনেক সময়, উপেক্ষার চক্ষে দেখি, এবং সুবিধা পাইলে, তাহার সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হই না।

রাণী সানন্দে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন, এবং ২।৩ দিন পরে, সেই স্থানে আসিয়া, বাস্তবিকই দেখিতে পাইলেন, প্রকাণ্ড

"রাজ-পুরী।" তাঁহার পিতা মাতা সযত্নে, সাগ্রহে তাঁহাদিগকে ঘরে তুলিয়া লইলেন, এবং আদর যত্নে কতিপয় দিবস তাঁহাদিগকে প্রাসাদে রাখিয়া বিদায়কালে, প্রচুর অর্থ, মণি মুক্তা ইত্যাদি উপহার প্রদান করিলেন। রাজা ও রাণী ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

ছোট ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের এইরূপ উপহার ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া, ছোট রাণীকে বলিলেন, তোমারও পিত্রালয়ে যাইতে হইবে, আমিও সঙ্গে যাইব। ছোট রাণী বিপাকে পড়িয়া ভগ্নীর পরামর্শ লইলেন, এবং তাঁহার নির্দ্দেশ মত সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্রসর হইয়া বাস্তবিকই দেখেন, অজগর, সেইভাবে বল্মীক স্তূপোপরি পড়িয়া আছে। যেমনি তাহার সম্মুখীন হইলেন, অমনিই তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কৃতঘ্নতার ফল হাতে হাতে ফলিল। পিতৃভবন দর্শন শেষ হইয়া গেল।

এই গল্প যখন শেষ হইল,—তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। চতুর্দ্দিকে ঘোর কালো কুট্‌কুটে অন্ধকার। নিশীথিনী প্রশান্ত, গভীর নিস্তব্ধ। কেবল ঝিল্লিকুল ঝিঁঝিঁ রবে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আকাশে তারকাকুল, মিটিমিটি জ্বলিতেছে। তবুও আকাশ মলিন, নিষ্প্রভ এবং শোভাশূন্য; কেবল অন্ধকারের পর ঘোর অন্ধকার। আজ নভোমণ্ডল "নক্ষত্র-ভূষণ চন্দ্র" এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে। কখনও কখনও দু একটী পাখী বৃক্ষশাখার অন্তরাল হইতে, পক্ষ সঞ্চালন করিতেছে; এবং ঐ শব্দে অন্যান্য পাখীকুল নৈশ গীতে বন-ভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। একেই সমস্ত

দিনের পরিশ্রমে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে রাত্রিও অধিক হইয়াছে, শ্রান্তের পক্ষে শয্যাই এখন শান্তির একমাত্র উপাদান। তাড়াতাড়ি চারিটা উদর নামক মহা-গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া, শয্যায় গা ঢালিয়া, আমি—
"ঘুমঘোরে আছিঁ অচেতন।"

নিদ্রার ঘোরে, সেই হরিণ, সেই জঙ্গল, সেই কোলাহল, এবং সেই হাতীর উপর তোলা হরিণ, সকলি, প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। সকলি মানস সরোবরে ভাসিতে লাগিল! চিকিৎসকগণ বলেন,—স্বপ্ন, গাঢ় নিদ্রা কি সুস্থতার লক্ষণ নহে। ঐ রজনীতে আমার গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল কি না, হলপ করিয়া বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, প্রাতে যখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি, তখন মানসিক, কি শারীরিক কোনরূপ অসুস্থতা আদবেই বোধ হইতেছিল না বরং অন্যান্য দিন অপেক্ষা সেই দিন অধিকতর স্ফূর্ত্তিতেই ছিলাম।

রাত্রি শেষ প্রায়। অত্যন্ত শীত, শয্যা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। পাখীকুল প্রভাতী গাইল, কাকের কর্কশ রবে, কমনীয় ঊষা ফুটিয়া উঠিল, সূর্য্যদেব, বাহির হইয়া পড়িলেন, চতুর্দ্দিক আলোকিত। বাধ্য হইয়া শয্যা ত্যাগ করিতে হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি, ঘোর কুয়াসা, এমতা-বস্থায় শিকারে বাহির হওয়া বড় সহজসাধ্য নয়। এক দিকে কুয়াসা, অন্য দিকে শিকারের আগ্রহ, এই দু'য়ের প্রতিযোগি-তায় শিকারের আগ্রহই জয়লাভ করিল। তাই, তাড়াতাড়ি হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ জলযোগে প্রাতঃকৃত্য সমাপন

করিয়া হস্তীতে আরোহণ করিলাম। পূর্ব্বদিন হরিণ বধ জন্য সকলের প্রাণেই স্ফূর্ত্তি, অতএব অন্যান্য দিনের মত আজ আর শুভ যাত্রায় বিলম্ব হইল না। শুভযাত্রার আদেশ মাত্র ;—মাহুতগণ "আল্লা" "আল্লা" ধ্বনি করিল, এই ধ্বনি বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

———o———

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

রাঙ্গামাটিয়া শিবির—ময়মনসিংহ।

আমরা আস্তে আস্তে জঙ্গলাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, হস্তিসকল তাহাদের চিরাভ্যস্ত মন্থর গমনে প্রভাতী মলয়ে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। চারিদিক কুয়াসা সমাচ্ছন্ন, যেন তিমিরের এক অস্পষ্ট মলিনাবরণ প্রকৃতির গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যদিও কুয়াসায় প্রকৃতির ফুল্ল দৃশ্য একটু চাপিয়া রাখিতে প্রয়াস করিতেছে, কিন্তু তবুও আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেশ অনুভব করিলাম এ গত কল্যকার পথ নহে, আজ এ এক নূতন পথে যাইতেছি।

খুজি সাহেবের হাতী আমার একটুকু আগে আগে যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; “ওহে বুড়ো মিঞা, কোন্ দিকে যাইতেছ? এ’ত কালকার পথ নহে! তোমার নিশ্চয় ভুল হইয়াছে। বোধ হয় কুয়াসার জন্য তুমি রাস্তা চিনিতে পার নাই।”

খুজি। হুজুর ঠিক যাইতেছি; ভুল হয় নাই। আজ আর গত কল্যকার জঙ্গলে যাইব না, আজ “বাঁশআরার” বাইদে যাইব মনে করিয়াছি।

খুজির পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই কথিত স্থানের বনপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। গত কল্যকার সমরসঙ্কট মনে পড়িল। কিন্তু আজ সুপ্রভাত, বোধ করি মহাপুণ্যের ফলে, কোন ভাগ্যবানের মুখ দেখিয়া নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছি (সে ভাগ্যবান্ যদিও আর কেহ নহে, আমার এক উড়িয়া বেহারা) তাই আজ আর দুর্ভোগ ভুগিতে হইল না, সহজেই রাস্তা পাইলাম। উহাকে সচরাচর "সড়াই" বাড়ীর (জঙ্গলের পথ) রাস্তা বলে। ঐ রাস্তার কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া, বামে ফিরিয়া, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই অরণ্যস্থিত অভ্রভেদী শালতরু সকলের বিরাট-গম্ভীর অবয়ব দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সমস্তটা রাস্তা আমার সেই বাবু বন্ধু, ফরাজীমিঞার সহিত যেন কি চুপি চুপি বলিতেছিলেন। ভাব ইঙ্গিতে যতটা অনুমান হয়, বোধ হইল যেন পূর্ব্ব রাত্রের প্রস্তাবিত বন্দুকের মন্ত্র-তন্ত্র শিক্ষা লাভই তাহাদের সে গুপ্তলীলার উদ্দেশ্য ছিল। আমি নীরবে হাতীর গদিতে বসিয়া আছি; ওষ্ঠাধর একটি চুরটের সহিত থাকিয়া থাকিয়া খেলা করিতেছে; মন, গত কল্যকার শিকারের কৃতকার্য্যতার চিন্তায় তোল-পাড়ীত; আর অন্য' দিকে আজ কি হইবে, কি করিব; কালকার মত মহেন্দ্রযোগ পাইব কি না, এ চিন্তাও সময় বুঝিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে দু একবার উকি ঝুকি না মারিতেছিল, এমত নহে। সুতরাং প্রাণটী বড় নিশ্চিন্ত রকমের ছিল না। হৃদয়ে উৎসাহ এবং সঙ্কোচের একটা ঔতপ্রোতিক সংঘর্ষণ চলিতেছিল।

আমি যখন এইরূপে চিন্তামগ্ন, হাতীগুলি তখন হঠাৎ

থমকিয়া দাঁড়াইল, ধ্যান হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি, বাবু হাতী হইতে পিছলিয়া পড়িয়া, ফরাজী মিঞার সহিত একটু দূরে, বনান্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের মন্ত্র-তন্ত্র মুখস্থ ও মন্ত্রপূত করিয়া দুটি বন্দুক বোঝাই করিয়া লইলেন। নীরবে একটু হাসিলাম; আর ঐ অবসরে আমি ও আমার শিকারীদ্বয় আমাদের বন্দুক ভরিয়া লইলাম। বাবু এবং খুজি সাহেব পুনরায় হাতীতে আরোহণ করিলে পর, ফরাজী মিঞার আদেশক্রমে, হাতীর লাইন গাঁথা হইল এবং সম্মুখে একটু অগ্রসর হইয়া দক্ষিণে একটী নিম্ন চতলের দিকে ঘুরিলাম। উহার উপরিভাগে স্তূপে স্তূপে সারি সারি ছিন্ন শাল তরু স্থাপিত ছিল।

এই বনটি প্রসিদ্ধ নাটোর মহারাজের অধিকারভুক্ত, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, যিনি এই বিশাল অরণ্যের মালীক, তিনি তাঁহার অরণ্যবাসী চতুষ্পদ প্রজানিচয়ের প্রতি একেবারেই দৃষ্টিহীন। ইহাদিগের সহিত তাঁহার আদৌ পরিচয় নাই, কিম্বা ইহাদের রক্ষার জন্য কোন সুবন্দোবস্ত আজ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। মহারাজের সামান্য মনোযোগ এবং দৃষ্টি থাকিলেই এই বন শিকারপ্রাপ্তির পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইত।

স্থানীয় মাটিয়া পলোয়ানগণ (Native Shikaries) প্রতিদিন শিকার করিয়া হরিণবংশ সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইলেও এখন আর একটি মাত্র হরিণের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে কি না সন্দেহ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যাহার যে বিষয়ে রুচি নাই, যাহার যে বিষয়ে প্রবৃত্তি নাই, তাহা

দ্বারা সেই কার্য্যের সৌকর্য্য সম্পাদন, আকাশ-কুসুম অথবা শশ-বিষাণ সদৃশ। শ্রদ্ধা কার্য্যের প্রবর্ত্তক; প্রবৃত্তি প্রবিষ্টতার নিয়ামক, প্রবিষ্টতা লাভ করিতে পারিলে নির্ব্বাহের বুদ্ধি আপনিই আসিয়া সম্পূর্ণতার পথ দেখাইয়া দেয়! এই কয়েকটি সম্বন্ধসূত্র সম্মিলিত হইলে যে কর্ম্মফল একান্ত শুভপ্রদ হইয়া দাঁড়াইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। মহারাজার যখন এ বিষয়ে অভিলাষ নাই কি শ্রদ্ধার আভাসমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, তখন আমার মত শিকারীর এ বিষয়ের জন্য পরিতাপ, অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাইতেছি, একটি ঘাসবন ভাঙ্গিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছি, সকলেই সচকিত, সতর্ক এবং প্রস্তুত। বনের দিকে বন্দুকের নাল নোয়াইয়া শিকারীগণ প্রতি মুহূর্ত্তে শিকার প্রত্যাশা করিতেছে। বনটি বড় সুন্দর (Very likely jungle,) ঐরূপ বন হইতে শিকার বাহির হওয়া নিতান্তই উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন প্রকার শিকারই বাহির হইল না।

সে সময় ঐ বনে শিকার না পাওয়ায় এই মনে করিলাম, মানুষের ন্যায় পশুগণও শীতাতপে ক্লিষ্ট। শীতের সময় গরম স্থান এবং গ্রীষ্মের কালে শীতল ছায়ায় তাহারাও আশ্রয় লইয়া থাকে। শীতের প্রভাত, ঘাস জঙ্গল সমস্ত শিশিরসিক্ত, তাই যে যাহার আশ্রয়স্থানে আছে। এমত সময় আমাদের ঐরূপ ঘাস জঙ্গলে যাওয়াই একান্ত অশিকারীর কাজ হইয়াছে।

ঘাসবন হইতে বাহির হইয়া আস্তে আস্তে আমরা একটা

"চালার" উপর উঠিলাম। এই উচ্চ স্থানটি (চালা) অতি সুন্দর, বড়ই প্রীতিপ্রদ। শত শত ঊর্দ্ধশির পলাশ বৃক্ষ শাখা-প্রশাখায় স্বর্ণফুল লইয়া ভগবান্ মরীচিমালীকে অর্ঘ্যপ্রদান উদ্দেশে স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুএকটী দয়েল শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া অদূর অরণ্যে মধুরতান তুলিতেছে। স্থানে স্থানে কোণে-কানায় দু-একটী টগরফুলের ঝাড় শ্বেতপুষ্প-পরিশোভিত হইয়া, বনভূমি আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর শালগাছ গুলি সেই কুঠারহস্ত কঠোরপ্রাণ কাঠুরিয়াগণ, 'এই বুঝি আসিতেছে' ভাবিয়া যেন শিরোত্তোলনপূর্ব্বক অপ্রসন্ন ও উদ্বিগ্ন ভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে।

বন-ভূমির এই শোভা দেখিতে দেখিতে নানারূপ ভাবের আবেশে ক্রমে অগ্রসর হইতেছি; এমন সময় আমার দক্ষিণ দিকে, প্রায় দেড়শত হাত ব্যবধানে, "গুম্" করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। আওয়াজেই বুঝিলাম এটি "রায়ফলের" শব্দ। ক্ষণপরেই পুনরায় ঐ দিক হইতে পুনঃ পুনঃ বন্দুকের গভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইয়া, চালা হইতে বাইদ, বাইদ হইতে বন, এবং বন হইতে বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, বনচারী পশু পক্ষীদিগকে চমকিত করিয়া তুলিল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলাম "পড়েছে পড়েছে," বুঝিলাম শিকার পড়িয়াছে। মনে স্বতঃই কেমন একটা উৎসাহের ভাব জাগিল, মুখে কেমন একটা আনন্দের প্রবাহ ছুটিল! "পড়েছে" শুনা মাত্রেই মাহুত একবার মাত্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আর অভিপ্রায় সাপেক্ষ না করিয়া ঐ দিকে বেগে হাতী

চালাইতে আরম্ভ করিল। আমার যে ঐ দিকে যাওয়ার কি শিকার দেখার প্রবৃত্তি একেবারে না ছিল, এমন নহে। কাজেই হাতী দ্রুত চালাইবার পক্ষে কোনরূপ প্রতিবন্ধক জন্মাইলাম না। আমি পূর্ব্ব দিনের মেনী হাতীতেই ছিলাম, কাজেই অতি দ্রুত সকলের আগে বধ্যভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমি যখন পঁহুছিয়াছি তাহার কিয়ৎপূর্ব্বেই ঢোলাইন বেচারীর মৃগলীলা শেষ হইয়াছে। (Female Sumber) তখন বাবুও আসিয়া পঁহুছিলেন; সকলেই তুষ্ট, সকলের মুখই প্রফুল্লতায় ভরপূর। শিকারীদ্বয়কে যথেষ্ট "বাহবা" দিয়া শিকার হাতীতে তুলিতে অনুমতি করিলাম; বলামাত্র ৭।৮ জন মাহুত ও মেট ক্ষিপ্রকরে ঐ বধিত * মৃগটি হাতীতে "নাদিল" (Pilkhana term) অর্থাৎ হাতীতে উঠাইয়া বাঁধিল।

পুনরায় আমরা লাইন করিয়া চলিলাম, বিস্তর হরিণ ও গাউজ দৃষ্টিপথে পতিত হইল সত্য, কিন্তু আক্ষেপ, অজস্র গুলি বর্ষণেও তেমন একটা ফল ফলিল না; কেবল গুলি বারুদের ধূমপুঞ্জে চারিদিক মেঘাচ্ছন্নবৎ করিয়া ব্যর্থমনোরথে মৌন-ব্রত অবলম্বন করিলাম। পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখি, বেলা ১২টা।

উদর নামক মহাসাগরে এখন ভাটা পড়িয়াছে—কিছু আহারের ব্যবস্থা করিয়া জোয়ার না আনিলে, আর তিষ্ঠান যায় না, তাই একটি স্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত গাছের তলে যে স্থানটিতে শাল গাছের ঝাড়, তেঁতুল গাছ ও শিমুল গাছ প্রভৃতি বিট-পীতে পরিশোভিত ছিল, তথায় একখানা কম্বল বিছাইয়া বাবু

* বধিত, ব্যাকরণদুষ্ট পদ হইলেও শ্রুতিমধুর বলিয়া এস্থানে প্রয়োগ করিলাম।

এবং আমি যেমন এক দিকে নানারূপ খোস খেয়ালে শিকারের কথা কহিতে কহিতে, জলযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছি, তেমন অপর দিকে, এই সুযোগে শিকারীদ্বয় ও মাহুতগণ তাহাদের সেই মান্ধাতার ফেসনের "থোবরা থোবরা" ভুতো ভুতো অপরিষ্কৃত কল্কীতে তাহাদের গৃহজাত তামাকু সাজিয়া ধূমপানে মত্ত হইয়া নানারূপ কথা যুড়িয়া দিল। এই ব্যাপারে অতি কম, অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। অল্প দিন হইল, মিস্ তরু দত্তের একটি কবিতা পাঠে আমাদের সেই বিশ্রাম স্থানের সৌসাদৃশ্য মনে পড়িল ;—

"What glorious trees! the sombre saul,
On which the eye delights to rest.—
The betel-nut, a pillar tall,
With feathery branches for a crest ;
The light-leaved tamarind spreading wide,
The pale faint scented bitter Neem,
The Seemol, gorgeous as a bride,
With flowers that have the ruby's gleam."

হায় সে দিন, সে দৃশ্য, অনেক দিন বিস্মৃতির আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে!—

—"হায়! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে স্মৃতি
আনিছ সে দুঃখরাশি আজি এ হৃদয়ে।"

তৎপর পুনরায় হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, লাইন বাঁধিয়া বনাভিমুখে চলিতে লাগিলাম,—আমি লাইনের বামে এক প্রান্তে ছিলাম, ধীরে ধীরে খোসখেয়ালী ভাবে যাইতেছি আর



ময়ূরের নাচ—৬৭ পৃঃ

"ব্রাইয়ার" উড্‌পাইপে ধূমপান করিয়া বনভূমি প্রধূমিত করিয়া চলিতেছি ;—এমত সময় অদূরে লাল রঙের কি এক রকম গাছ দেখিতে পাইলাম, ইঙ্গিত মতে মাহুত ঐ স্থান লক্ষ্য করিয়া হাতী চালাইল,—সম্ভবপর নিকটে আসিয়া দেখিলাম, উহা আর কিছুই নহে ;—নব-পল্লব-পরিশোভিত অতি মনোহর শালচারার ঝাড় (Group) স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে ঘেরিয়া আছে। সে দৃশ্য এত চিত্তাকর্ষক যে, ক্ষণকালের নিমিত্ত আমি সেখানে মুগ্ধহৃদয়ে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম—প্রাণ ভরিয়া ঐ শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমত সময় দেখি, আমার হাতী যেখানে দণ্ডায়মান, তাহার অনতিদূরে চারি পাঁচটি ময়ূর একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। সে দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না ; যিনি তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহা, তাঁহাকে বুঝান আমার মত অ-কবির সাধ্যাতীত। বৃত্তাকারে চারিদিকে ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া উন্নত গ্রীবায় গর্ব্বের সহিত শনৈঃ শনৈঃ নৃত্য করিতেছে। আর কেন্দ্রস্থলে একটি ময়ূরী, ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানা রঙ্গে নৃত্য করিতেছে। যেন সমাগত প্রত্যেক ময়ূরেরই সাদরসম্ভাষণ এবং চিত্তবিনোদন তাহার উদ্দেশ্য। মরি মরি কি গ্রীবাভঙ্গি! কেমন তালে তালে পাদবিক্ষেপ, কি মধুর প্রেম, কেমন প্রেম-প্রেপ্সু! জীবনে এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই, এবং আর যে দেখিব এমত আশাও করি না। এই লীলা দেখিয়া বোধ হইল, বিধাতা বুঝি ময়ূর ময়ূরীর এ নৃত্যলীলার আদর্শেই মানব-সমাজে সুখের স্রোতে এই নর্ত্তন মাধুরী প্রচার করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, প্রাণ ঢালিয়া, অনিমেষে যে দৃশ্য দেখিতেছিলাম, এতক্ষণে এই ময়ূর ময়ূরীর লীলা খেলায় সেই মোহ ভাঙ্গিয়া গেল; দেখি দেখি করিয়া আঁখি তাহার সাধপূর্ণ করিতে পারিতেছে না। মোহে হৃদয় একেবারে মজিয়া গেল; কতক্ষণ এই লীলা দেখিতেছিলাম বলিতে পারি না, সময় নির্দ্ধারণশক্তি, আবেশে ডুবিয়াছিল;—তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এ অভিনয়ের চমক ভাঙ্গিল তখন, যখন অদূরে "গুম্" করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। বাবুর হাতী হইতে এই বন্দুকের আওয়াজ হইয়াছিল, শব্দেই বুঝিলাম এটি ছড়ার বন্দুক (Plainbore), শিকারও কিছু পড়িয়াছে তাহাও বেশ বুঝিলাম। কারণ, দেখিতে পাইলাম, হাতী দাঁড় করাইয়া বাবু ও অন্যান্য কয়েক জন নিম্নদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিতেছেন। আমি কিন্তু এ শিকারে একেবারেই তুষ্ট হইলাম না; অমন সাধের ময়ূরের নাচ! শব্দ মাত্রেই নিমেষ মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল; ময়ূরগুলি ত্রাসিতচিত্তে বনান্তরে লুকাইল।

কি করি—

"অরসিকের হাতে প'ড়ে সুখ হল না।" বিরসমনে, মাহুতকে বলিলাম 'চালাও'। সে মূর্খ আমার হৃদয় বুঝিল না, সে বরাবর বাবুর হাতীর দিকে হাতী চালাইতে উদ্যত-হইল, আমি তখন একটু বিরক্ত ভাবে, তাহাকে সোজা চালাইতে আদেশ করিলাম।

নিমেষ মধ্যে মাহুত সম্মুখস্থিত শাল ঝোপের নিকট অগ্রসর হইল,—তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতে



বন্য মোরগ শিকার—৬৯ পৃঃ

পাইলাম,—অদূরে একটি গাছের উপর খুব বড়জাতীয় সুন্দর একটি "মোরগ" বসিয়া আছে, এবং পাখীজাতির অভ্যাস বশতঃ ঠোঁট দ্বারা এদিক ওদিক চারিদিকে তাহার শরীর খুঁটিতেছে। আমার হাতী হইতে অনুমান ২০ হাত দূরে যখন ঐ মোরগটি অবস্থিত;—তখন আমি "ধ্বৎ" (হাতী দাঁড় করাবার বুলী) বলিয়া হাতী দাঁড় করাইলাম; এবং নেশানা করিয়া যেমনি বন্দুকের ঘোড়া টিপিলাম;—শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নালবিচ্ছুরিত ধূমজালের সহিত মোরগটিও ইহ-পাখি-লীলার জঞ্জাল মিটাইয়া ছটফট করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। বন্দুকটি "শিকারী-ভৃত্য" (Shikary Boy) বেচারীর হাতে দিয়া, উৎসাহের সহিত হাতী হইতে আমি লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম, এবং আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ভোঁ দৌড়িয়া নিজ হাতে ঐ শিকারটি তুলিয়া লইলাম। হায়! এই জীবের মৃত্যু আমার হাতেই হইল! তখন মনে পড়িল,—

Inhuman man! curse on thy barb'rous art,
And blasted be thy murder-aiming eye;
May never pity soothe thee with a sigh,
Nor ever pleasure glad thy cruel heart

Burns.

হায়! মোরগটির সংসারের লীলা খেলা যত কিছু সবইত আজ শেষ হইল! এই বনের সহিত তাহার যত সম্বন্ধ বন্ধন, নিমেষ মধ্যে সকলই ফুরাইয়া গেল! আর ঊষার প্রথম বিকাশে "কুক্করু কুক্কুরু" শব্দ করিয়া জীবগণকে তাহার জাগ্রত করিতে হইবে না।—নেউল মার্জ্জার প্রভৃতি শত্রুগণ কি শিকারী

দেখিয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে আর তাহাকে বনান্তরালে লুকাইবার চেষ্টা পাইতে হইবে না, তাহার সবই ফুরাইল, জীবন-প্রদীপ আজ নিভিয়া গেল।

এই ত সংসার,—এই ত সংসারের লীলা খেলা!—আজ যাহা দেখিতেছি, কাল আর তাহা দেখিতে পাইব না! জীবের জীবন বাস্তবিকই পদ্মপত্রের জলবিন্দুবৎ, এই আছে এই নাই। কোটি কোটি জীব এই কর্ম্ম-ভূমিতে জন্মিতেছে, আর জল-বুদ্‌বুদের মত ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া কি যেন কোথায় মিশিয়া যাইতেছে—এই সকল; "—কোথা হ'তে আসে কোথা ভেসে যায়', কে তাহার নির্দ্দেশ করিবে? তিন যুগে যাহা স্থির হইল না, আজ যে তাহা স্থির হইবে এ আশাই দুরাশা। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

—"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ।"

(গীতা ২য় অঃ ২৭)

"একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ;
তবে কেন এত আশা, এতদ্বন্দ্ব কি কারণ!
যত্নে তৃণ-কাষ্ঠ খান,
রহে যুগ পরিমাণ,—
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ, না হয় বারণ।"

এই ঘটনা ত প্রত্যহই দেখিয়া আসিতেছি;—কিন্তু তবুও কি অন্ধ আমরা,—কি মুগ্ধ, ভ্রান্ত জীব জগতের, কিছুতেই আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছো না। একবার ভ্রমেও

"—শেষের সে দিন হয় না স্মরণ।"

কিন্তু তখন ব্যাধবৃত্তিতে আমার মন এতই কলুষিত, যে,

একটি সামান্য প্রাণীর বধজনিত আনন্দে আমি একেবারে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলাম। তখন সে আনন্দ-তরঙ্গে, ক্ষণকালের জন্য ময়ূরের সে লীলা খেলা ভুলিয়া গেলাম, বলিতে কি। I was so proud that I strutted about there like peacock on a green. শিকার হাতে করিয়া খুব স্ফূর্ত্তির সহিত ইতস্ততঃ ঘুরিতেছি এমন সময় বাবু তথায় আসিয়া স্মিতমুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি মারিয়াছেন?"—

উত্তরে, আমি তাহার অন্য কোনরূপ জবাব না করিয়া, প্রশ্ন করিলাম; "ভাল তুমি কি মারিয়াছ?"

বাবু,—ছোট্ট একটি হরিণ;

আমি,—কোথায়?

বাবু,—ঐ দেখুন পিছনের হাতীতে।

আমি, পিছনের দিকে একটু সরিয়া উঁকি মারিয়া বলিতে লাগিলাম;—

"ছিঃ! কি লজ্জা, কি আক্ষেপ, তুমি এই নিরীহ বাচ্চাটি কেন বধ করিলে?—এ বোধ হয় ১৫।২০ দিনের বেশী এ জগতে আসে নাই। আমি তোমার চেয়ে অনেক ভাল কাজ করিয়াছি,—এই দেখ কেমন বড়,—কত বড় মস্ত মোড়গ, দেখ ইহার পাখা গুলি কি মনোহর, কি সুচিত্রিত ও কোমল! এই ধর,—দেখ, এটা কত ভারী।" এই বলিয়া পাখীটি তাহার হাতে দিলাম, তিনিও হাতে লইয়া আমার শিকারে তুষ্ট হইলেন, এবং পাখীটি তাঁহার চারিজামার মধ্যে অতি যত্নে রাখিয়া দিলেন।

তখন বেলা অনুমান, দুইটা হইয়াছে। আমি তাঁবুতে ফিরিবার প্রস্তাব করিলাম, বাবুও স্বীকার করিলেন; শিকারী-

দ্বয় যাহারা একটু দূরে ছিল,—তাহাদিগকে ইঙ্গিত করা হইল, সকলে একত্রিত হইলে ফরাজী মিঞার উপদেশ মতে রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। বাবু চারিজামা ত্যাগ করিয়া আমার গদীর হাতীতে আসিলেন ও তাহার হরিণশিশু বধ-মন্ত্রের গুণ ও মন্ত্র-শক্তির শত মুখে প্রশংসা করিয়া ফরাজী মিঞার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সাড়েসতর আনা চেষ্টা করিলেন। ঐ দুই প্রহরের দিশদিগ্ধ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে বাবুর মতের প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে না করিয়া, যোল আনা কথাই ধৈর্য্যাবলম্বনে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম এবং শোম ফাঁক বুঝিয়া হুঁ করিয়া সকল কথাই সারিয়া লইতে লাগিলাম।

যখন তাম্বুতে পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় অবসান, পশ্চিমাকাশ অস্তগামী সূর্য্য কিরণে তখনও রঞ্জিত। গগনমণ্ডল পক্ষিগণের কাকলীতে পূর্ণ, দূর বনে তখনও সূর্য্যকর ক্রীড়া-পর। আমরা আতপতাপে প্লুষ্ট। একটু বিশ্রামান্তর শীতল জল দ্বারা স্নান করিয়া প্রুষ্ট দেহের ক্লিষ্টতা দূর করিয়া ধীরে ধীরে পাচালি করিতে করিতে পিলখানার দিকে চলিলাম। কুক্কুরীদ্বয় আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, তাহারা আমাদের শিকা-রের—"অনারেরী প্রহরী"। যাইতে যাইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই রাস্তার উপর একটি "ছাগ-গর্ভধারিণী" আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেখামাত্র কুকুর দুইটি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ছাগী বেচারীর উপর লাফাইয়া পড়িল।

এ শান্তিভঙ্গের কারণ ছাগীর অনধিকার প্রবেশ, এই ত্রুটি "বিবি ও কুইনীর" সহ্য হইল না, তাই উহাকে অগৌণে আমাদের সীমার বাহির করিয়া দিল!

হাতী দেখিয়া যখন তাম্বুতে ফিরিলাম, তখন প্রকৃতি অন্ধকার আবরণে আবরিত হইয়াছে, চন্দ্রকলা আকাশের এক প্রান্তে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে শোভা পাইতেছে, দু একটি তারা মিট মিট জ্বলিতেছে ;—মনে পড়িল,—

"মিটি মিটি দূরে,
কে তোরা উপরে,
বল জ্যোতি দেহরে"।

পাখিসকল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আপন আপন বাসার অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাবু তাম্বুর বাহিরে একখানা চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সখের বন্দুকটি পরিষ্কারে নিবিষ্ট। আর আমি এক "আরামকেদারায়" আমার ক্লান্ত-ক্লিষ্ট দেহখানা ঢালিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিলাম। স্নিগ্ধ সান্ধ্যসমীরণ বেশ ফুর ফুর করিয়া বহিতেছিল, সমীর পরশে শরীর নিতান্ত অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। এমত সময় আমাদের খুজি ফরাজী সাহেব "আদাব" বলিয়া লম্বা হাতে সেলাম বাজাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। বাবুর গুণ-জ্ঞানের ওস্তাদ, আর কথা কি! সে সময়ে তাহার ভারি পায়া, তাই সাগ্রহে বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন—মিঞা সাহেব মুসলমানী কায়দায় পুনরায় সেলাম করিয়া আসন গ্রহণ করিল। সে দিন আমার শরীরটা বড় ভাল ছিল না, কেমন একটু সর্দ্দি সর্দ্দি ভাব। যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল ; তাই বাবুকে বলিলাম "চল ভিতরে যাই, শরীর ভাল বোধ হইতেছে না, বোধ হয় যেন সর্দ্দি হবে"। বাবু—"তা হতে পারে, বিকালে অধিক পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে স্নান করাটা ভাল হয় নাই।"

আমাদের কথা শুনিয়া খুজী সাহেব একটু মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, দেখিলাম যেন তাহার সেই দীর্ঘ ঘন শ্মশ্রুর ফাঁক দিয়া চোরা হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ফরাজী সাহেব হাস যে, হয়েছে কি?"—

খুজী। "হুজুর, একটি গল্প বলি অনুগ্রহ করিয়া শুনুন"— আমি সাধারণতঃ গল্পপ্রিয়, সুতরাং অমনি অনুমতি করিলাম, সাহেব গল্প আরম্ভ করিল।—

হারন্‌অলরসীদ নামে এক বাদশা ছিলেন—যদিও বার্দ্ধক্য তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া থাকুক, কিন্তু তিনি এই যুবা বয়সেই রোগে ক্লিশিত, শরীর অতিশয় ক্ষীণ, কিছুতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল বোধ হইত না। এক দিন উজীরকে বলিলেন, "দেখ, আমার এ হ'ল কি? কিছুতেই যে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে না? আমি সর্ব্বদা গরম কাপড়ে আবৃত থাকি, সুখাদ্য খাই, বাত বৃষ্টি কি রৌদ্রে কখনও বাহির হই না। মোট কথা, স্বাস্থ্যের জন্য যতটা সতর্কতা লইতে হয় তাহা লইয়া থাকি কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তবুও সর্দ্দি লেগেই আছে, সর্ব্বদাই জ্বর জ্বর ভাব।"

উজীর হাসিয়া উত্তর করিল—"জাঁহাপানা! আপনাদের শরীরে রোগ না থাকিলে হেকীম, কবিরাজ, ডাক্তারগণ আর কি করিয়া বাঁচিবে? আপনাদের ব্যাধি প্রকৃত প্রস্তাবে কিছু নহে; সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ির ফল—"সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্"। বিশ্বাস না হয় এখনি তাহার প্রমাণ দেখাইতেছি;" এই বলিয়া মাঠ হইতে এক রাখাল বালককে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "জাঁহাপানা! এ বালক,

রৌদ্রে শুকায়, বৃষ্টিতে ভিজে, কদন্ন খায়, অনাবৃত শরীরে থাকে, অনেক সময় গাছের নীচেই ঘুমায়, বোধ করি ইহার জীবনেও গরম কাপড় কেমন তাহা দেখে নাই, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় কি তাহা আস্বাদন করে নাই, দেখুন ইহার শরীর কেমন বলিষ্ঠ, গোলগাল, যেন পিটিয়া গড়ান হইয়াছে। রাজশ্রীর অভিরুচি হইলে ইহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইহার কোন ব্যাধি আছে কি না?" উজীরের নির্দ্দেশ অনুসারে বাদশাহ ঐ রাখাল বালককে প্রশ্ন কয়িয়া জানিলেন, যে উহার শরীরে কোন অসুখ হয় নাই। বাদশা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"এর কারণ কি?" উজীর উত্তর করিলেন, "আর কিছুই নহে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্" বেশী কিছুই ভাল নয়, অধিকন্তু, প্রকৃতির ব্যত্যয় ঘটাইলেই অপ্রাকৃত ফল ফলিতে বাধ্য। ধর্ম্মাবতার! দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহারও প্রমাণ দেখাইতেছি।"

রাখলি বালককে লইয়া উজীর রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কিছু দিনের জন্য বাদশাহের চাল চলনে ও রীতি নীতি অনুসারে ঐ বালককে রাখিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। বালক এখন রৌদ্রে বাহির হইতে পায় না, বৃষ্টির জলে ভিজে না, সর্ব্বদা গরম কাপড়ে বাঁধা থাকে, মাংস, পোলাও ইত্যাদি সুখাদ্য আহার করে, টানা পাখার বাতাস খায়, পরিষ্কার জল পান করে, ঠিক যেন বাদশাহের পুত্র। কিছুদিন এইরূপ যত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হওয়ায় বালকের আচার ব্যবহার ও ধাতু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এক দিন বড় দুর্য্যোগ, ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইতেছে,

বাদশাহ উজীরকে বলিলেন তোমার সে বালক কোথায়, এখন তাহার অবস্থা কি? উজীর তাহার পূর্ব্ব প্রস্তাব প্রমাণীকৃত করার উদ্দেশ্যে অনাবৃত দেহে বালককে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। বালক বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যাশায়ী হইল। তাহার ভয়ানক জ্বর বিকার হইল, ২।৪ দিনের মধ্যেই বাদশাহের সমস্ত চিকিৎসকগণের ঔষধ এবং শত চেস্টা উপেক্ষা করিয়া বালক ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

গল্প যখন এই পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে, তখন রাত্রি ৮॥টা। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "আহার্য্য প্রস্তুত"। এইখানে গল্পের বিরাম দিয়া আমরা আহারে গেলাম। গেলাম সত্য, কিন্তু আমার মনোমধ্যে ঐ গল্পটি উঠা-পড়া করিতে লাগিল। এবং নিজেই বলিলাম,—ধিক আমাদিগকে! আমাদের অবস্থাও ত ঠিক ঐরূপই হইয়াছে। আমাদের দেশ ঠিক এইভাবে অধঃপাতে যাইতেছে। আমরা কি ঘোর পরানুকরণপরায়ণ! উষ্ণপ্রধান ভারত, আমরা তথায় বাস করি, আমাদের সর্ব্বদা গরম কাপড়ে বাঁধা থাকার আবশ্যকতা কি? ঐরূপ বস্ত্র যাহাদের দেশে উপযোগী তাহারা ত পরিবেই,—আমাদের কাক হইয়া পরপরিচ্ছদে, মুহূর্ত্তের জন্য ময়ূর সাজিবার প্রয়োজন কি? আমরা "ভেতো বাঙ্গালী" ডাল ভাত আর শাক-সবজী, না হয় তাহার উপর কিছু মাছ খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব; তৎপরিবর্ত্তে কাটলেট, রোস্ট, পোলাও প্রভৃতি পলাণ্ডু মিশ্রিত ইংরেজী খানাতে আমাদের জাতীয়তা ধ্বংস করিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি নষ্ট করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমত এক খণ্ড

কাষ্ঠে কাষ্ঠকীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীর্ণ করিতেছে অথচ বাহ্যাবয়বে তাহা উপলব্ধি হয় না, আমাদের অবস্থা ঠিক তাহাই। আমাদের অভ্যন্তর যে অন্তঃশূন্য হইয়া আসিতেছে, তাহা কি আমরা একবারও চিন্তা করি? হায়! ভ্রমেও তাহা করি না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ,—একটু সূক্ষ্ম ভাবে অনুশীলন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—যাঁহারা মোটা ভাত, মোটা কাপড়,—শাক সবজী প্রভৃতি আহার ও সামান্য পরিচ্ছদমাত্র ধারণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই বা কি ছিলেন আর আমরাই বা কি হইয়াছি। তাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতা, একাগ্রতা এবং শ্রমসহিষ্ণুতার সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে আমাদের ক্ষমতা, অধ্যবসায় শতদশমাংশের ক্রম হইতেও লঘু বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে জমীদার সম্প্রদায়, দশজন মোহরীর কার্য্য নিজে নির্ব্বাহ করিতেন। শাসন, সংরক্ষণ, প্রজাপালন, স্বদেশপ্রিয়তা এবং শিক্ষা ইত্যাদির সমুদয় কার্য্য ভার নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আর এখন সে স্থানে আমরা লম্বা লম্বা বেতনে ম্যানেজারের পদ সৃষ্টি করিতেছি এবং তাহাদের উপর সর্ব্ব প্রকার কার্য্য ভার "সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে" অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে নানারূপ বিষয়বিবর্জ্জিত খোষ খেয়ালে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। পূর্ব্বে সাহিত্যসেবীগণ অপরিসীম সহিষ্ণুতা এবং গবেষণা বলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এখন সে স্থানে কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা—কেহ

ছোট ছোট দুইটি গল্পের বহি লিখিয়াই শ্রান্ত।—ইহার কারণ আর কিছুই নহে, দেশবিগর্হিত আহার, পাশ্চাত্য ব্যবহার এবং বেশ ভূষা পরিধানে আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমে নষ্ট হইয়া শ্রমশীলতা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

এই পরানুকরণপ্রিয়তায় যে কেবল আমরাই উৎসন্ন হইতেছি এমত নহে, আমাদের সন্তান সন্ততিগণের জীবনের পথেও আমরা কণ্টকজাল বিস্তার করিয়া যাইতেছি। যে দেশের প্রসূতিগণ পূর্ব্বে তৈল ম্রক্ষণ করিয়া শিশু সন্তান-গণকে রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিয়া সংসারশ্রমোপযোগী করিয়া গঠন করিতেন, আজ সেখানে তূলায় জড়াইয়া গরম কাপড়ে বাঁধিয়া আমাদের শিশু সন্তানদিগকে ননীর পুতুল গঠিত করা হইতেছে। ইহার চরম ফল যে রাখাল বালকের ন্যায় তাহার সন্দেহ নাই। ধন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার অমোঘ আক্রমণ! ধন্য তোমার কৌশল বিস্তার! বাস্তবিক কবি মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই গাহিয়াছেন—

—"পরভাষণ, আসন, আননরে,
পর পণ্যে ভরা, তনু আপনরে,
পরদীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

আমরা কোট পরি, হেট ধরি, টেবুলে খাই, কাঁটা চামচা নাড়ি, আর যতই কেন—ইংরাজীতে বক্তৃতা করি না, আমিও বলি—

"আমরা যেই বাঙ্গালী
আমরা সেই বাঙ্গালী"।

আহারাদির পর আমার দেহ খানা শিকারীপালঙ্কে ঢালিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর কোমল অঙ্কে সমর্পণ করিলাম। জাগতিক সকল প্রকার চিন্তা ক্ষণকালের জন্য হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল এবং সুখস্বপ্নের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলাম। কত ঘণ্টা এইরূপে ঘুমাইয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু সুনিদ্রা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অনুমান করিলাম রাত্রী বেশী নাই। প্রভাতী বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছিল। দুই একটি পাখী যেন ডাকিয়া আবার নিঃশব্দ হইতেছিল। এ তাঁবু ও তাঁবু হইতে দুই একজন লোকের কাশির ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। পিলখানা হইতে মাহুতগণ—

"আল্লা হো আকবর
আল্লা হো আকবর
আসো হাদান লায় লাহা
ইল্‌লেল্লা আসোহাদোয়ান
না মহম্মদ রছুলাল্লা-"

বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক নমাজ পড়িতেছিল, পরক্ষণেই আমার বাবু বন্ধু—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং
দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং
আপদস্তস্য নশ্যন্তি
তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।"

বলিতে বলিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটু

স্মিতমুখে বলিলেন "এই যে সাক্ষাতেই সূর্য্য"। উত্তরে আমি হাসিয়া বলিলাম—

"তা বটে, এ কুয়াসাভাঙ্গা প্রভাতের চিক্ চিকে সূর্য্য"।—

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। আজ আমাদের বিশ্রাম দিন, "Off day"। হাত মুখ ধুইয়া চা সেবন করিয়া লইলাম। বাবু পূর্ব্ব দিনের সেই হরিণটি কাটাইতে ছোলাইতে ব্যস্ত। তিনি আজ স্বয়ংই উহা রান্না করিবেন, তাই আয়োজন উদ্যোগটা অন্য দিন অপেক্ষা আজ একটু জাঁকাল রকমের।

আমি নূতন শিকারী, এ সময়টা একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া তাম্বুতে বসিয়া থাকা আমার যেন বড় ভাল বোধ হইতে লাগিল না। বুট পরিয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গ-লের দিকে চলিলাম, উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, জঙ্গলী মোরগ শিকার করা আর লক্ষ্য ঠিক করা। কুকুরীদ্বয়ও আমার সঙ্গে চলিল, পথিমধ্যে কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি আমাদের পিলখানার দুইটি হাতী চাড়ার (fodder) জন্য যাইতেছে; জঙ্গল মারান জন্য তাহাদিগকে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবার অনুমতি করিলাম। জঙ্গলের কিনারায় পঁহুছিয়া আস্তে আস্তে যাইতেছি, অতি সন্তর্পণভাবে শিকার অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু কিছুই মিলিল না। যাইতে যাইতে এইভাবে অনেকটা দূর চলিয়া গেলাম, সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র তারা বন, "wild cardamoms". কুকুরীদ্বয় বন প্রান্তে উপস্থিত হইয়াই আমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া ব্যাকুলতা সহ মহাকলরবে "খেউ—খেউ" করিতে আরম্ভ

করিল। আমি কাণ পাতিয়া বেশ অনুভব করিলাম, যেন আমাদের সম্মুখভাগ হইতে "খস্ খস্" করিয়া কি একটা জানোয়ার জঙ্গলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিষয় কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আর, তখন তাহা বুঝিবার শক্তিও ততটা ছিল না, কারণ আমি নূতন শিকারী; তবুও সাহসে ভর করিয়া একটু দক্ষিণ দিকে সরিয়া ঝুঁকিয়া দেখিলাম কিন্তু কিছুই চক্ষে পড়িল না। "খস্ খস্" শুনিয়া জানোয়ার আছে মনে করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গাইলাম। বন ভাঙ্গাইলাম সত্য, কিন্তু আমার ভাঙ্গা আশা যোড়া লাগিল না। আমি তখন আর পায়দলে শিকার করা তত নিরাপদ মনে না করিয়া তাম্বুর দিকেই চলিলাম। পথে লক্ষ্য স্থির উদ্দেশ্যে কতকগুলি ঘুঘু এবং অন্যান্য পাখী শিকার করিলাম; ক্ষিপ্রহস্ততা অভ্যাস তাহার অন্যতম কারণ ছিল।

তাম্বুতে ফিরিয়া দেখি, বাবু রন্ধনশালায় রন্ধনকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত। সাধারণ হইতে মাত্রা একটু চড়িলেই হৈ রৈ ব্যাপার, তাতে আজ বাবু নিজে অগ্নির আরাধনা করিতেছেন,—ব্যাপার কিছু গুরুতর! ঘি দে, মস্‌লা দে ইত্যাদি বাবুর চীৎকারে কেম্প একেবারে সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। রন্ধন-ব্যাপারে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অবশ্য বলিতে হইবে। "Your fine Egyptian cookery shall have the fame." প্রভাতে পাখীর কলরবে আর কেম্পের লোকজনের কোলাহলে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আজ শিকারে বাহির হইতে হইবে, তাই ত্বরা করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম। তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দেখি পূর্ব্বাকাশ লালেলাল, যেন সিন্দুর মাখান। ঊষার

আগমন দৃষ্টি করিয়া বুঝি, নিশীথিনী লজ্জান্বিতা হইয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ছুটিয়া পলাইতেছেন, অলস-বিভ্রমে তাঁহার সিন্দুরের কৌটাটী নভঃপথে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া সুরসিক সূর্য্যদেবের রসিকতা পারাবার উথলিয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত সিন্দুর টুকু কুড়াইয়া নিজ গায়ে মাখিলেন ও গণেশের লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে পূর্ব্বাকাশের দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। প্রভাতী তারা এই রহস্য উজ্জ্বল নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল, শুধু দর্শন নহে—দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু উষ্ণ রশ্মি এই পরিহাস সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে রক্তিম ভাব ধারণ করিলেন, তাহা দেখিয়া প্রভাতী তারা অপ্রতিভ হইয়া মলিন বদনে যথাস্থানে অপসৃত হইল।

একটু পরেই চিক্ চিকে রৌদ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমরাও হাত মুখ ধুইয়া চা পান করিতে বসিলাম, কেবল চা নয়, উহার সহিত কিছু গুরু জিনিষও জঠরে দিয়া এমত ভাবে পূরণ করিয়া লইলাম যে ১০ কি ১২টার মধ্যে টিফিনের "Tiffen" হাতীর আর যেন তত্ত্ব করিতে না হয়। আমরা যখন চা পান করি, তখন হাতী সকল প্রস্তুত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত, ভৃত্যগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত। কেহ বন্দুক হাতীর উপর দিতেছে, কেহ আহার্য্য বস্তু অন্য হাতীতে উঠাইতেছে, সকলেই ব্যস্ত ও তৎপর। যখন এই সমস্ত ব্যাপার শেষ, তখন "শিকারী ভৃত্য" আসিয়া সংবাদ দিল, সকল প্রস্তুত; আমরা আর বিলম্ব না করিয়া হাতীতে উঠিলাম ও জঙ্গলাভিমুখে চলিলাম। অনতিবিলম্বে আমরা জঙ্গলের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম বনের "কামলাগণ" জঙ্গল

কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিয়াছে। পথ সুদীর্ঘ কিন্তু অপরিসর, তাহার উপরিভাগ নিবিড় জঙ্গলাবৃত। ঐ পথ ধরিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে উপরিস্থিত বৃক্ষ-শাখা ও লতাগুল্ম তাহাদের সস্নেহপ্রেম পরশে আমাদের মস্তকের আঘ্রাণ লইতে ও আলিঙ্গন করিতে ত্রুটি করিল না। এই রাস্তার দুই পার্শ্বেই বৃক্ষশ্রেণী, তাহা লতাপাতায় ঢাকা। উভয় পার্শ্বেই গভীর অরণ্য, সে অরণ্য যে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি নানা হিংস্র জন্তুর বাসভূমি, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই রাস্তার অল্প দূরে দক্ষিণ ভাগে একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝর-ঝর শব্দে প্রবাহিত হইয়া নিম্ন বানার নদীতে যাইয়া মিলিতেছিল। কম্পপুরের মোহনা হইতে এই নদীটি বাহির হইয়া কাশীগঞ্জ, গৌরগঞ্জ এবং শিবগঞ্জের নীচ দিয়া কাওয়াইদের নিকট বড় বানারে মিলিয়াছে। ঐ ঝরণার নির্ম্মল জল পশু-পক্ষীতে পান করে, উহার উভয় পার্শ্বে ছোট বড় হরিণ, বাঘ, ভালুক ও অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্নে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আমরা এইরূপ ভাবে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম। যদিও সময় সময় গাছের ডালে ও লতায় আমাদের মাথার টুপী স্থিরভাবে থাকিতে দিতে ছিল না ও ব্রুশ করা অর্থাৎ পাটী করা চুলের বাহার নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা হইলেও রাস্তা যে বড় সঙ্কটাপন্ন ছিল তাহা নহে। বেশ আস্তে আস্তে যাইতেছি, মনের খেয়ালে বসিয়া আছি ও পাইপের ধূম পান করিতেছি, এমত সময় মাহুত মিঞা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মাইল মাইল" (পিলখানার ভাষা অর্থাৎ সাবধান,—মাইল শব্দে স্থান বিশেষে উঠে দাঁড়াও

বুঝায়) অমনি সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটা বৃহৎ নালার ন্যায় খাত, খাতের পর পারে পথ দেখিতে পাইলাম; নালা পার না হইলে শিকার ভূমি পাওয়া যাইবে না, সুতরাং যে যেরূপেই হউক, উহা পার হইতেই হইবে। বাবু ও আমি উভয়েই এক যোগে খাতে নামিলাম। নামা যেমন তেমন, কিন্তু উঠাই কঠিন, উহাই প্রকৃত "মাইল" শব্দ বাচ্য;—অপর পার এমত খাড়া যে হাতীর উঠিতেও বিশেষ কষ্ট ও সময় সময় তাহার পদও স্খলিত হইয়াছিল। দেখিলাম বাবুর বড় কষ্ট উপস্থিত, নিজেকে রক্ষা করিলে বন্দুক থাকে না, আবার বন্দুক রাখিতে গেলে নিজে পড়েন; পড়েন ত মরেন! তথায় "পপাত চ মমার চ" নিত্য সম্বন্ধ। এই উভয় সঙ্কটে নিজে ও বন্দুকে ধুম জড়াজড়ি। অবশেষে "আত্মানাং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এই মহাজন বাক্য স্মরণপূর্ব্বক নিজকে রক্ষা করা শাস্ত্রসঙ্গত স্থির করিয়া, বন্দুকই ত্যাগ করিলেন। সখের বন্দুক বাবুর হস্তচ্যুত হইয়া খাতমধ্যে পড়িয়া জলে নিমগ্ন, ও কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। পাঁচ কি সাত মিনিট ভীষণ সংগ্রামের পর আমরা উপরের সমভূমিতে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ও একটুকু দম লইয়া একটী হাতীর "কামলাকে" বাবুর বন্দুক আনিতে আদেশ করিলাম। ঐ ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে এক লম্ফে হাতী হইতে নামিল ও দৌড়িয়া খালের মধ্যে গেল। আশ্চর্য্য! এই যে—যে স্থানে হাতী উঠিতে এত কষ্ট, এত হাঙ্গামা, ও প্রতিমুহূর্ত্তেই বিপত্তি আশঙ্কা করিয়াছি, ঐ বালক সেই স্থান হইতে অক্লেশে ও অগৌণেই বন্দুকটী আনিয়া দিল।

বাবু তাঁহার বন্দুক গ্রহণ করিয়াই পকেট হইতে রুমাল বহিষ্করণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা যতদূর সাধ্য বন্দুকের বাহির ও ভিতর পরিষ্কার করিয়া লইলেন। আমরা ঐ পথ ধরিয়া আরও কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলাম ও একটী চালায় উঠিয়া দেখিতে পাইলাম দুইপার্শ্বে শালবন, বৃক্ষসকল স্তম্ভের ন্যায় শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মহাকবি কালিদাসের "শাল প্রাংশু" উপমা এই শ্রেণীর শালবনের দৃশ্য দেখিয়াই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ করি। গাছগুলি দেখিতে ঠিক্ যমজ ভ্রাতার ন্যায়; কারণ সকল গুলির আকৃতি প্রায় এক প্রকার, উচ্চতা ও শাখাপ্রশাখা সকল বিষয়ে সকল বৃক্ষগুলিই যেন এক। এই শালবনের মধ্য দিয়া ঐ অপ্রসস্ত পথ অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। বাবু তাহার বন্দুকের জন্য বড়ই অপ্রসন্ন, অন্য কেহ কোন কথা বলিতেছে না, সকলেই নির্ব্বাক—তখন যেন কি এক অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা এই নিবিড় শালবনে রাজত্ব করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া মাহুতের "ধৎ ধৎ" ও "ছই ছই" শব্দ শুনা যাইতেছিল, কিন্তু সেই বিস্তৃত বনের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মাহুতের সেই শব্দই আমা-দিগকে চমকিত করিতেছিল;—স্থির জলে ঢিল মারিলে ঢেউগুলি যেমন আস্তে আস্তে একেবারে কিনারায় যাইয়া লয় পায়; মাহুতের ঐ শব্দও ঠিক সেইরূপ গভীর অরণ্যে মৃদু প্রতিধ্বনিত হইয়া ডুবিয়া যাইতেছিল।

রাস্তার মধ্যে দুইটী কামলার সহিত দেখা হইল। উভয়ের হাতে এক একখানি সুধার দা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র দৃষ্ট হইল না। তাহাদের সহিত আলাপে বুঝিলাম নিকটেই, উহা-

দের আড্ডা; শিকারের "বন্দে" যাইতে হইলে তাহাদের বাসার উপর দিয়াই যাইতে হইবে। বন্দে হরিণও খুব আছে শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলাম এবং বাবুকে বলিলাম—

"A merry heart goes all the day
A sad tires in a mile."

অবিলম্বেই "কামলাদের" বাসার নিকট উপস্থিত হইলাম। ঐ আড্ডা ঝরণার পারে স্থিত। কুটীরগুলি শালপাতায় ও টাঙ্গিবন (একরূপ খড়) দ্বারা প্রস্তুত। আশে পাশে দুই চারিটা গেঁন্দা ফুলের গাছ, আর স্থানে স্থানে ভাঙ্গা হাঁড়ীর স্তূপ ও রাশীকৃত ছাই। মাহুতগণ ঐ স্থানে হাতী দাঁড় করাইয়া তাহাদের শীতল কণ্ঠকে ধূমপান দ্বারা একটু গরম করিয়া লইল; তৎপর আমরা পুনরায় শিকারভূমি লক্ষ্য করিয়া চলিলাম ও অচিরাৎ একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম "সাগরদীঘী", আকৃতি দেখিলে দীঘীটী বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু উহার প্রকৃত বয়স কি হইবে, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ ব্যতীত অন্যের নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই। পুকুরটী বহু পুরাণ হইলেও ইহার জল বেশ পরিষ্কার, ও স্বচ্ছ। উভয় পার্শ্বে দুইটী ইষ্টকনির্ম্মিত বান্ধা ঘাট ছিল, তাহার পরিচয়, তখনও বিদ্যমান। ঐ বান্ধা ঘাটের উপর বৃহৎ একটী বকুল গাছ শাখাপ্রশাখা প্রসারণ করিয়া প্রহরীর স্বরূপ নিয়োজিত আছে। বোধ করি উহা প্রকৃতিরাণীর রাজত্বের মিউনিশিপালপ্রহরী। ঐ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে অন্য কোন বৃক্ষ, বড় বেশী লক্ষিত হইল না, কেবল আম, কাঁটাল, চামল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং পলাশ



সাগর দীঘির পারে বিশ্রাম—৮৬ পৃঃ

বৃক্ষের সংখ্যাই প্রচুর দৃষ্ট হইল। আমরা ঐ স্থানে হাতী অপেক্ষা করাইয়া পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক ভালকরিয়া দেখিয়া লইলাম। তৎপর হাতী সহ চারিপার ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু তৎসময় কোন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আমাদের লক্ষ্যে পড়ে নাই, পরে জানিতে পারিয়াছি তাহাও রহিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই মধুপুরের গড়ে অথবা বনে, এক সময় লোকের বসতি ছিল, এবং পুকুর, দালান, প্রাচীর ও ইষ্টকাদির সত্তা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে আমাদের সে অনুমান ও ধারণা অমূলক নহে। এই বন এক সময়ে বহু সমৃদ্ধিশালী লোকের আবাস স্থানই ছিল। কিন্তু পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল; ইহার কিছুই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং বিলাসের লীলাভূমি ঐশ্বর্য্যশালী মধুপুরও কালের কঠোর শাসনে কলেবর পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আজি নিবিড় অরণ্য, ও নানা হিংস্র জন্তুর আবাস গৃহে পরিণত হইয়াছে।

"Where her high steeples whilom used to stand,
On which the lordly falcon wont to tower,
There now is but a heap of lime and sand,
For the screech-owl to build her baleful bower."

"মরি মরি দেখি একি নগর এখন।
নাহি চিহ্ন ধন জন, নিবিড় গহন।
ধীরাজ বিক্রমালয়, কিরূপে হইল লয়,।
হেন মম মনে লয়, এ কি শমন সদন।
সে যে সহজে সহ যে প্রজা রাজহীন পুরী।
যথা শ্রীহীন মলিন ক্ষীণ পতিহীন নারী॥

চলে চাইতে চাইতে চারিদিক চলচিত্ত।
যথা পরীপাটি রাজবাটী হয় উপনীত ॥
করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে।
তথা বানর বানরী সনে সুখে কেলি করে ॥
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রীসাথ বসিতেন ধীরে।
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীরে।
দোঁহে দেখে এই দৈব দুঃখে দুঃখিত হৃদয়।
যবে যায় জলাশয় যথা আছে জলাশয় ॥
দেখে সুচারু শোভিত সরসিজ সরোবর।
সদা শোভিছে সোপান সারি সব থরে থর ॥
জল চলে ঢল ঢল, পিক করে কলকল।
মন করে চল চল, আঁখি করে ছল ছল ॥"

আমরা যখন পুকুরের পার ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছি ঐ সময় ৪ কি ৫টি মহিষ পুকুর হইতে ত্রস্ত ব্যস্ততার সহিত ঝপ. ঝপ্ করিয়া উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু একটু চকিত ভাব। মাহুতগণ বলিল ঐ মহিষ, "অরণা"—আমি নূতন শিকারী, জঙ্গলা কি পোষা তখন সে বিষয়ে বোধ ছিলনা। খুজীমিঞাও তখন নিকটে নাই, সুতরাং মাহুতের কথায় একটার উপর গুলি ছুড়িলাম। গুলি যাইয়া পেটে বিদ্ধ হইল, যেমন বিদ্ধ হওয়া, অমনি একধারে (নরদমার ন্যায়) রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। মহিষগুলি না পলাইয়া আমার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া রহিল। খুজীসাহেব অগৌণে আসিয়া পালা মহিষ মারিয়াছি বলিয়া যথেষ্ট অনুযোগ করিল ও নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া ঐ স্থান সত্বর ত্যাগ করিবার উপদেশ দিল। আমরা



মহিষ শিকার—৮৮ পৃঃ

তখন গত্যন্তর না দেখিয়া অবিলম্বে স্থান ছাড়িয়া চম্পট দিলাম। ঐ আহত মহিষটির পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা আর পরে জানিতে পারি নাই। অবশ্য মরিয়াছিল ; কষ্ট,—অতি যন্ত্রণা পাইয়াই মরিয়া থাকিবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

খুজীমিঞার উপদেশ অনুসারে, হাতী কিছু লম্বা কদমে চলিতে লাগিল ; অনেকটা পথ ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা শিকারভূমিতে পঁহুছিলাম। দীঘী হইতে শিকার বন্দ "বাঁশ আঁড়া" বড় বেশী দূরে নয়।

আমার মন, লজ্জা ও দুঃখ মিশ্রিত থাকায় একটুকু বিসন্ন, তাই অপ্রতিভ হইয়া চুপটী করিয়া হাতীর পিঠের উপর বসিয়া আছি। সম্মুখ দিয়া ২।৩টী খাটুয়া Barking deer হরিণ ছুটিয়া পলাইল, ক্ষিপ্রহস্ততার অভাবে, মারা দূরের কথা, বন্দুকও তুলিলাম না। বাবু ধাঁ ধাঁ করিয়া ৪।৫ চোট আওয়াজ করিলেন, ও দু একবার বলিলেন "লেগেছে—লেগেছে" কিন্তু আমি লাগার কিছু দেখিতে পাইলাম না, এবং ফলও তদ্রূপ বোধ হইল না।

এই "বাঁশ আঁড়া" বাইদটী মধুপুর জঙ্গলের মধ্যস্থল বলিয়াই অনুমান হইল। স্থানটী নিবিড়,জনশূন্য, বড় শান্তিপ্রদ, ঠিক যেন প্রকৃতি সুন্দরীর নিভৃত কুঞ্জ। কোথাও শ্যামাপাখী বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া মনের উল্লাসে মধুর সঙ্গীত গীত করিতেছে, কোথাও ময়ূরময়ূরীর কর্কশ "কেকা" প্রখরণ ; টিয়ে-পাখীর দল টেঁ-টেঁ করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া বসিতেছে, হরিণের চীৎকারে বনভূমি তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে; ডার-

উইনের অসংস্কৃত সাধু, অর্থাৎ বানরগুলি তাহাদের "বাচ্চা কাচ্চা" লইয়া শাখার উপর বসিয়া কিচিমিচ্ করিতেছে। আর, এডাল হইতে ওডালে লাফাইয়া পড়িতেছে, এবং নানাবিধরূপে মুখভঙ্গি করিয়া আমাদিগকে আদর অভ্যর্থনা জানাইতেছে। আমি যখন এই সকল দৃশ্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেছি, তখন শুনিতে পাইলাম, ফরাজী মিঞার শ্বেতশ্মশ্রু ভেদীশব্দ "পূর্ব্বমুখে লাইন ধর" যেমনি নির্দ্দেশ, অমনি সতর্ক হইয়া বেশ সক্ত হইয়া বসিলাম, এবং ১৬নং বন্দুকটী হাতে তুলিয়া লইলাম। আমি লাইনের দক্ষিণদিকেই রহিলাম।

আমি হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া, বনের গাছ পালা, বনফুলের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, পাখিগণের মৃদু কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত, কাণের ভিতর দিয়া, মর্ম্মস্পর্শ করিতেছিল, এমত সময় মাহুত হাতী দাঁড় করাইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাকে একটী খরগোশ দেখাইয়া দিল।

চাহিয়া দেখিলাম, ঐ নিরীহ ক্ষুদ্র জীব একটী ঘাস ঝোপের আড়ালে, অন্যদিন যেরূপ খায়, আজও নির্ভয়ে সেই রূপেই শিশিরসিক্ত ঘাস খাইতেছে। হায়! সে জানেনা, যে তাহার ভোগ শেষ হইয়াছে, মৃত্যু সন্নিকট, যম, তাহার পশ্চাৎ ভাগ হইতে বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে। যেমনি ছরার বন্দুক লইয়া ঘোড়া টিপিলাম, অমনি বন্দুকের মুখনিঃসারিত ধূমপুঞ্জ ও অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গে 'চিঁ' শব্দ করিয়া খরগোশ বেচারী কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। শিকারীভৃত্য নামিয়া উহা উঠাইয়া লইল। বন্দুকের আওয়াজ আর হাতী দাঁড় করান দেখিয়া, বাবুর আর ঔৎসুক্য দমিল না,—

ভাবিলেন, আমি একটা 'কিম্ভূত কিমাকার" শিকারীই না জানি হইয়াছি, সুতরাং, তিনি অন্য প্রান্ত হইতে "ধা-ধা" করিয়া বেগে হাতী ছুটাইয়া নিকটে আসিয়া হাজির। শিকারী বালক শিকারটি হাতে করিয়া তুলিয়া বাবুকে দেখাইলেন;—তিনি স্মিতমুখে পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

লাইন আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল;—হরিণ প্রচুর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বাবু এবং আমি যে পরিমাণ আওয়াজ করিয়াছিলাম, সংখ্যানুক্রমে তাহার অর্দ্ধেকের কম শিকার হইলেও স্মরণীয় অর্থাৎ Record এর বিষয় হইত। তখন আমরা সকলেই ধনুর্দ্ধর, কাযেই এত হরিণের মধ্যে একটিকেও গুলি লাগাইতে পারিলাম না। আক্ষেপ হইল, মনমধ্যে বড়ই অনুতাপ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করি; "কলের কায বলে হয় না"—আমার শিক্ষা ও সাধনার অনেক বাকি আছে, এই সবে হাতে খড়ী, ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা করিতে ক্রটি করিলাম না। এই ভাবে যখন নিজ অপারগতার বিষয় চিন্তা করিতেছি; বাবু তখন একটি কালো তিত্তির-পক্ষী Partridge মারিলেন। আমি অবশ্য তাহা দেখিতে পাইলাম না, শুনিলাম বাবু "তিতৈর" মারিয়াছেন।

লাইন এইভাবে, মৃদু-মন্থর গমনে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। হরিণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে; কিন্তু আমি এত বিরক্ত যে আর বন্দুক স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বামের হাতিগুলি, অধিকতর বামে বিস্তার হইল, এতদূরে গেল যে

বাবুকে বড় একটা দেখা যায় না। আমি একা পড়িলাম, খুজীমিঞা কোথায় তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না।

সরল ভাবে যাইতেছি—যাইতে, যাইতে, ঘোর অরণ্য মধ্যে উপস্থিত। এই বন এমন ঘনকণ্টকাকীর্ণ যে হাতী প্রবেশ করানই কঠিন ব্যাপার। ঘোর অন্ধকার, ঊর্দ্ধে, অধে, পার্শ্বে এবং চারিদিকে কেবল গভীর ঘন অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু হাতীর জঙ্গল ভাঙ্গার কড়-মড় শব্দ, সময় সময় কাঠ বিড়ালের চিক্ চিক্ রব আর নানা জাতীয় পাখীর কাকলী লহরী শ্রুতিগোচর হইতেছিল। অনেক কষ্টে ও কণ্টক পীড়নে শরীর স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হওয়ার পর জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একটি "পোড়ান বন্দে" * উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সঙ্গীয় অন্যান্য হাতীর কোন সংবাদ নাই, আমিও তাহার কোন তত্ত্ব করিলাম না। ঐ পোড়ান বন্দ দিয়া যাইতেছি, সম্মুখে নবপল্লব-পরিশোভিত সুন্দর একটি শালবনের ঝাড় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, উহার চারিদিক ঘাসবন দ্বারা বেষ্টিত। একটু নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, ঐ শাল ঝাড় মধ্যে একটি গাউজ (সাম্বর) তন্দ্রালস অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। আমার হাতী উহার পিছনের দিকে ছিল। গাউজটি দেখিয়াই আমার শিথিল হৃদয়ে এক বৈদ্যুতিক তেজ সঞ্চার হইল, শীতল হৃদয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ১৬নং বন্দুক হইতে ছরার কার্ত্তুস বাহির করিয়া, দুইটি গুলি পুড়িলাম এবং গাউজ

* শিকার উদ্দেশ্যে বা গড়ের কামলাগণের কাজের সুবিধার জন্য, অনেক সময় জঙ্গল পোড়াইতে হয়; তাহাকে শিকারী ভাষায় "পোড়ান বন্দ" বলা হয়।

লক্ষ্য করিয়া নিশানা ধরিলাম। আমি তখন ঘোর আনাড়ী, ঐরূপ ভাবে লক্ষ্য, শিকারবিধির বিরুদ্ধ। প্রণালী মতে লক্ষ্য করিতে হইলে, আরও একটু ঘুরিয়া অর্থাৎ যে স্থান হইতে উহার প্রশস্ত পার্শ্ব দৃষ্ট হয়, সেখানে দাঁড়াইয়া বাহু লক্ষ্যপূর্ব্বক গুলিকরাই উচিত ছিল। কিন্তু আমি তখন বিধিজ্ঞ নই, সুতরাং যে অংশ দেখিতে পাইলাম তাহা লক্ষ্য করিয়াই গুলি ছুড়িলাম। হায়! এরূপ ভাবে অশিকারীর মত গুলি করিয়া যে কর্ম্মভোগ ভুগিলাম তাহা এজীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি; গাউজটি তন্দ্রাবেশে, ঝিমিতেছিল; আমি পাশ্চাৎভাগ হইতে উহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করাতে গুলি যাইয়া গাউজের দক্ষিণ পায়ে বিদ্ধ হইল। গাউজ খোঁড়া হইয়া দৌড়িতে লাগিল, এই ভাবে কিছুদূর দৌড়াইয়া, একস্থানে ঝোপের ভিতরে ক্ষণেকের জন্য মাথা লুকাইয়া একটু থামিয়াই পুনরায় দৌড়িতে আরম্ভ করিল। দ্রুত হাতী চালাইয়া তাহার অনুসরণ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছি না। আমরা যতই অগ্রসর হই, আহত মৃগ ততই দূরে পলাইয়া যায়। বড়ই বিব্রত হইলাম;—"জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাইর চৈত্র মাসে রাস" আমরাও তাহাই, আমি নূতন শিকারী, এই গাউজের ন্যায় প্রকাণ্ড জন্তুর উপর এই প্রথম গুলি, তাহাও ব্যর্থ হয় নাই; শিকার খোঁড়া করিয়াছি, এ "নাই মামা" নহে,— "কাণা মামা"; কিন্তু শিকার লাগ পাইতেছি না। নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া, হাতী হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলাম। হাতী

ছাড়িয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়া যাইয়া, অতি সতর্কতার সহিত ঠিক মত একটি গুলি করিব, তাহা হইলেই আমার আজকার শিকার সার্থক, এই মনে ভাবিয়া বন্দুকটি হাতে করিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলাম, পোড়া নলবন আমাকে ঢাকিয়া লইল। প্রথম কয়েক পদ, গাউজটি যে দিকে ছিল সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই চলিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই সুফল লাভ করিতে পারিলাম না; গাউজের কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। "আশা বৈতরণী নদী"—কেবল আশায় নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে অনেক দূর চলিলাম, কিন্তু কতদূর অগ্রসর হইয়াছি বলিতে পারি না। নিঃশব্দে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কত পোড়া নলবন ঠেলিয়া, কত বল্মীক স্তূপ অতিক্রম করিয়া, কত বাইদ ও গভীর শালবন ভেদ করিয়া যে চলিতে লাগিলাম তাহার সংখ্যা নাই। এইভাবে চলিতে চলিতে পোড়া নল খাগড়া ঠেলিতে ঠেলিতে আমার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, কোথায় যাইতেছি, কোন্ দিকে ধাইতেছি কিছুই লক্ষ্য নাই। আমার সঙ্গীরা কোথায়, হাতী কোথায়, হরিণই বা কোথায় লুকাইল কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এই আকস্মিক বিপত্তিতে মনের বল ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল, হীনসাহস হইলাম। সমস্ত শরীরের শোণিত প্রবাহ যেন শীতল হইয়া ক্রিয়াবন্ধ করিতে চলিল।

সেই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন সময়ে, গভীর অরণ্য মধ্যে, যাহার চতুর্দ্দিকে কেবল হিংস্র জন্তুর বিচরণের পদচিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; তাহার অবস্থা যে কি, পাঠক!

এক বার ভাবিয়া দেখুন ;—ভীতি এবং ক্লান্তিবশে আমি কতকটা জড়সড়, কণ্ঠশুষ্ক ; যেন শ্বাস রোধ হইয়া আসিতে লাগিল, আর চলিবার শক্তি নাই। একে পোড়াবন, তাহাতে অসমান ভূমিতে উঠিয়া পড়িয়া চলিতে চলিতে বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সম্মুখে একটি পলাশফুলের প্রকাণ্ড বৃক্ষ দণ্ডায়মান দেখিয়া, ক্লান্তদেহে বৃক্ষটিতে হেলান দিয়া দাঁড়াইলাম ;—দাঁড়াইয়া আছি এমত সময় সন্ সন্ করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া যেন কি একটা জানোয়ার আমার দিকে বেগে আসিতে লাগিল। একে আমি বন ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে পিপাসায় কণ্ঠশুষ্ক, এরূপ অবস্থায় এরূপ আকস্মিক কাণ্ডে আমি একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম ;—আমার শুষ্কজিহ্বা যেন শঙ্কিত সর্পের মত কণ্ঠগহ্বরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অনুপায়ে পড়িয়া, সেই অন্ধকার বন মধ্যে, চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। হায়, এইবার বুঝি বিপাকে পড়িয়া শেষে শ্বাপদের হস্তে প্রাণ হারাই। তখন স্বতঃই প্রাণে কেমন ভগবদ্ভাব জাগিল ; তন্ময়চিত্তে প্রাণের প্রাণকে স্মরণ করিলাম, এবং সাশ্রুনয়নে ডাকিলাম হে বিপদতারণ! অগতির গতি, পতিতপাবন, হায়! এই কি শেষ তোমার মনে ছিল? আমার অদৃষ্টে কি শেষে এই লিখেছিলে, হিংস্র জন্তুর করে আমার বিনাশ? এই জন্যই কি প্রভু তুমি আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলে? পিতঃ! মরিব তাহাতে দুঃখ নাই, দুঃখ রহিল প্রাণে, জীবনে কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না, অনেক কার্য্য বাকী রহিল ; অকালে জল বিন্দুর মত জলেই

মিশিয়া গেলাম! দয়াময়! জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, আর উপায় নাই, তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম, রাখিতে হয় তুমিই রাখিবে, মারিতে হয় তুমিই মারিবে; তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সংসারের কি বিচিত্র লীলা! লোকপ্রকৃতি কি প্রহেলিকা-ময়। মনুষ্য যখন সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকে, যখন নির্ব্বিঘ্নে সংসারে বিচরণ করে, তখন ভ্রমেও একবার ভগবানের নাম কেহ স্মরণ করে না, করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু বিপদে পড়িলে—সংসারসাগরের ভীষণ ঘূর্ণা জলে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে আরম্ভ করিলে, কেহ আসিয়া বলিয়া দেয় না, কেহ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় না, কিন্তু মনে স্বতঃই সেই চিন্ময় মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। তখন তাঁহার মহিমার ক্ষীণ আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইয়া চারি দিকে যেন তাঁহার অস্ফুট অভিব্যক্তি দেখিতে পায়। আর এক অদ্ভুত অব্যক্ত ভাব হৃদয়ের স্তরে স্তরে মন্দাকিনীর মত শান্তিধারা ঢালিয়া দেয়। সাধক বুঝিয়াই গাইয়াছেন;—

"দুখ্ পাওয়েতো হরি ভজে,
সুখে না ভজে কোই
সুখ মে যো হরি ভজে,
দুখ্ কাহাসে হোই,"

(তুলসী)

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বিপদে আপদে ঈশ্বর স্মরণ ব্যতীত আর কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। সেই নৈরাশ্যের অকূল পাথারে এক সে ভগবানের নাম স্মরণেই যে



নল বনে বরাহ—৯৭ পৃঃ

আশার অভ্যুদয় হয়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই ; ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। অতএব যিনিই কেন মনে যাহা না ভাবুন, কি বলুন, তিনি সর্ব্বথারূপে বলিতে বাধ্য, ভগবান যেরূপ ভাবেরই জিনিস হউন না কেন, একটা কিছু আছেন। তাঁহার অসীম অনন্ত শক্তি জগৎব্যাপী। বিপদে পড়িয়া তাঁহার আশ্রয় লইলে, কাতরে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি কোনরূপেই আশ্রিতকে চরণে ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন না। অলক্ষ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার স্নেহের অঙ্কে টানিয়া লয়েন। তখন ভগবানের কৃপার পূর্ণ উন্মেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ভগবান বলিয়াছেন—

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেসামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥"

(গীতা ১২ অঃ ৬—৭ শ্লোঃ)

পলাশ গাছের নীচে, বন্দুক হাতে করিয়া ভীতহৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছি, জঙ্গল নড়া দেখিয়া, ভয়বিহ্বলচিত্তে, একাগ্রতা সহকারে বিপদভঞ্জন ভগবানকে স্মরণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম প্রকাণ্ড দংষ্ট্রবিশিষ্ট একটা বন্য বরাহ, আমার দিকে আসিতেছে ;—কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা, বরাহ-প্রবর কিছুদূর এইরূপ বেগে অগ্রসর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়াই একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং বরাহপ্রকৃতির দৃষ্টিতে এক বার মাত্র আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিয়া, দ্রুতপদে অন্য দিকে দৌড়িয়া গেল। আমি উপরের দিকে চাহিয়া

একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলাম। তৎপর চারি দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, চাই,—জল, জল! বহুদিনের কথা হইলেও উহা ভুলিবার বিষয় নহে, প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রত্যেক বিষয়, অক্ষরে অক্ষরে আমার মনে অঙ্কিত আছে। তৎসময়ে আতঙ্কে আমার কণ্ঠ ও জিহ্বা এমত শুষ্ক হইয়াছিল যে, শত মুদ্রার বিনিময়ে এক তোলা জল পাইলেও সাদরে গ্রহণ করিতাম।

"নিজে যে দুঃখিনী, পরোদুঃখ বুঝে সেইরে,
কহিনু তোমারে।"

যিনি ভুক্তভোগী, তিনি আমার তৎকালীন অবস্থা বেশ অনুভব করিতে পারিবেন। জানি না অন্যে মনে কি অনুভব করিবেন, বস্তুতঃ তখন আমি পিপাসায় অধীর; 'জল জল' বলিয়া উন্মনাঃ হইলাম;—

"In vain impels the burning mouth to crave,
One drop—one last—to cool it for the grave."
(*Byr*)

এই জন্যই জলের অন্য নাম জীবন। সে জীবন অভাবে আমার জীবন যায় যায় হইয়াছে। সতৃষ্ণনয়নে, কণ্ঠ বাড়াইয়া দু এক পদ অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু হায়! জীবনে নিরাশ! কি করি, অনুপায়ে, মহাবিপাকে ঠেকিয়াছি, ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে ভগ্ন আশায়, ভগ্নহৃদয়ে, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোন্ দিকে যাইতেছি পূর্ব্ব কি পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণ তাহা কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না, কেবল অনুমানের উপর

নির্ভর করিয়া দুই হাতে পোড়া নলবন ও খাগড়া ঠেলিয়া, ঘাসবন ভেদ করিয়া আঁখি যে দিকে টানিয়া লয়, সেই দিকেই চলিয়াছি। আর মনে ভাবিতেছি, হায়! এ সামান্য শিকার-সুখ-লালসায় মজিয়া এত বিড়ম্বনা, শেষটা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। কি পরিতাপ! আজ কাঁচের মূল্যে কি না অমূল্য জীবনমাণিক বিক্রীত হইতে চলিল!

কিয়ৎদূর যাইয়া দেখিতে পাইলাম, একটি ঝাঁপাল গাছের তলা শোণিতসিক্ত। একটু ভীত হইলাম। মনে হইল, কোন হিংস্র জন্তু বুঝিবা অপর কোন প্রাণী বধ করিয়া থাকিবে। কিন্তু আমার সে আশঙ্কা বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান পাইল না। কারণ, তদ্রূপ কোন ঘটনা হইলে স্থানে স্থানে নিশ্চয়ই আক্রমণের অর্থাৎ "হুড়াহুড়ীর" চিহ্ন দৃষ্ট হইত। কিন্তু তাহার কিছুই নাই। তবে এ কি? নিশ্চয় আমার আহত হরিণ, এস্থলে অপেক্ষা করিয়া পুনঃ অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছে। বৃক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম এবং শোণিত চিহ্ন ধরিয়া যে দিকে হরিণ গিয়াছে তাহাও একরূপ ঠিক করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। মাটিয়া পালোয়ানগণ (ব্যাধবৃত্তি ব্যবসায়ী ইতর শ্রেণীর লোক, পায়দলে যাহারা শিকার করিয়া থাকে) এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই শিকার অনুসরণ করিয়া থাকে এবং কৃতকার্য্যও হয়। তাহাদের ব্যবসায়ই ঐ, জঙ্গলের অভিজ্ঞতা আছে, বনে চলার অভ্যাস বিলক্ষণ, রাস্তাঘাটের তত্ত্বও তাহারা সবিশেষ অবগত; কিন্তু আমি সকল বিষয়েই

অনভিজ্ঞ ও অক্ষম, অধিকন্তু একান্ত ক্লান্ত; পিপাসায় অধীর, গতিকেই আমার পক্ষে তদ্রূপ উদ্যম শোভা পায় না। "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" অবস্থায় যখন দণ্ডায়মান,—তখন হঠাৎ মনোমধ্যে একটী সুন্দর ভাবের উদয় হইল (Happy thought) এবং আশার সঞ্চার হইল। তত্ত্বদর্শী ইহাকেই ভগবানের অস্ফুট অভিব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বরাহটি এত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দৌড়িয়া পলাইবার কারণ কি? ইহার অন্য কোনই কারণ নাই—নিশ্চয় আমার হাতী দেখিয়া ভয়ে এদিকে আসিয়াছিল। এই অনুমান সত্য হইলে, হাতী নিকটেই কোন স্থানে হইবে, ভাবিয়া আমার মনে আশার বিকাশ হইল। ভারবাহী তরণীর কর্ণধার অনুকূল বাতাস প্রাপ্ত হইল; মুমূর্ষের শয্যাপার্শ্বে স্বয়ং ধন্বন্তরী, শুভ আরোগ্যস্নানের ব্যবস্থা করিল; আমি উৎসাহের সহিত বন্দুকের নাল আকাশ মুখ করিয়া আওয়াজ করিলাম—উদ্দেশ্য হাতী নিকটে আসিয়া থাকিলে, আওয়াজ শুনিয়া, ধূম লক্ষ্য করিয়া আমি যে স্থানে আছি তাহা অনুমান করিতে পারিবে ও অনুসরণ করিবে। বস্তুতঃ আমার আশা, আকাশ-কুসুমবৎ নহে, যেমনি আমি আওয়াজ করিলাম, অমনি শিকারী ভৃত্য হাতী হইতে বন্দুক আওয়াজ করিয়া তাহার উত্তর লইল। আওয়াজে বুঝিলাম হাতী ১৫০ কি ২০০ শত গজ মাত্র ব্যবধানে আছে, আমি অধীর, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, সত্বর আসিবার জন্য উপর্য্যুপরি আরও দুইটি আওয়াজ করিলাম। প্রতি উত্তরে হাতী হইতে তাহারা আবার একটি আওয়াজ করিল।

আশায় নির্ভর করিয়া গাছে হেলান দিয়া হাতীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি;—"ফুর্—ফুর্" করিয়া একটি জা'ৎ হরিণ (Hog deer) সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। হাতী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ। অব্যাজে শুনিলাম,—"দেলে—দেলে, মাইল—মাইল"! (পিলখানার ভাষা) অর্থাৎ জঙ্গল ভাঙ্গ ও সাবধানে চল। বুঝিলাম, হাতী আসিয়াছে। ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন ত্রিযামা কোলে, গহন বনমধ্যে পথহারা পান্থ অদূরে দীপালোক দেখিয়া যেরূপ আশ্বাসিত হয়, কাছে হাতী দেখিয়া আমি তদ্রূপ আনন্দিত হইলাম। কিন্তু পিপাসায় সে আনন্দ শুষ্ককণ্ঠ চিড়িয়া আর বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। "জল জল" বলিয়া চীৎকার করিলাম, কণ্ঠ বাড়াইলাম, বন্দুক ফেলিয়া হাতীর পানে ছুটিলাম;—কিন্তু হায় কপাল!—

"অদৃষ্টে করল্লা ভাজা
তাহে বিচি ঘজ্ ঘচা"

বালক কাতর মুখে বলিল, "জল সে হাতীতে নাই! টিফিনের হাতীও দূরে।" "নাই" শব্দ যেন প্রাণে "খাই খাই" প্রতি আঘাত করিল; নৈরাশ্যে মুণ্ডু ঘুরিয়া গেল, জীবন তরী ডুবু ডুবু প্রায়। কি করি! অতি কষ্টে হাতীতে উঠিলাম, তখনও আশা আছে, "শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা।" শোণিতচিহ্ন ধরিয়া গাউজ যে দিকে গিয়াছে সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আর চারি দিকেই চাতকের মত চাহিয়া দেখি, জল কোথায়, টিফিনের হাতী কোথায়; কিন্তু হাতী নাই—হাতীর পরিবর্ত্তে কেবল জঙ্গল, জঙ্গলের উপর জঙ্গলই দেখিলাম।

মাহুত অতি সতর্ক ও সাবধানতার সহিত শোণিত লক্ষ্য করিয়া 'ডানে-বাঁয়' ঘুরিয়া ফিরিয়া নিম্নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিল;—আর সময় সময় রক্ত দেখিয়া "এই লৌ—ঐ পুরা নলর গায়, ডানে গেছুন" বলিতে বলিতে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই ভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখি, প্রায় শত হাত ব্যবধানে কয়েকটী কাঁচা নলখাগ্ড়া ও বন মাথায় কয়িরা প্রচ্ছন্নভাবে ঐ আহত গাউজটী শয়ন করিয়া আছে। হায়! শোণিতই এই শত্রুতা সাধিল—যে শোণিত শরীরপোষক, সময়ে তাহাই জীবননাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

"Cursed the blood that let the enemy to trace"

যে ভূমি, এতক্ষণ দুঃখের নিলয় জ্ঞান করিয়াছি, যেখানে নিরাশ-প্রাণে পরিতাপ করিয়াছি, এবং যাহার জন্য মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম,—এমন পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া আর জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিব না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ঐ আহত হরিণ দেখিবামাত্র, প্রাণে বিদ্যুত বহিল, ব্যাধবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, সকল দুঃখ, সকল শ্রম বিদূরিত হইয়া গেল। হৃদয়ের নিভৃত প্রান্তে কেমন একটুকু মধুর উৎসাহরশ্মির রেখা প্রতিভাত হইল।

হরিণ আমার বামভাগে ছিল, কালবিলম্ব না করিয়া, আগ্রহে বন্দুক ধরিলাম; পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম,—আবার, তার উপর আর একটা গুলি মারিলাম, গাউজ ঐস্থানেই রহিলেন।

এই উৎসাহে তৃষ্ণার বেগবৃদ্ধি পাইল, বুক ফাট-ফাট হইল।

'জল জল' বলিয়া আমি যখন অধীর, টিফিনের হাতী তখন দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মাহুত পাগড়ী খুলিয়া, ত্বরায় আসিবার জন্য ঐ হাতীর মাহুতকে বারবার ইঙ্গিত করিতে লাগিল। আমার আর ব্যাজ সয় না; আমার হাতীও ঐ হাতীর দিকে বেগে ছুটাইলাম, এবং হাতীটি ধরিয়া একটানে একবোতল জল পান করিয়া ফেলিলাম, কণ্ঠ ও জীবন শীতল হইল।

আমি যখন জল পান করি, বহুদূরে আমার বামদিকে "দ্রুম-দ্রুম" বন্দুকের দুই আওয়াজ হইল। অন্যান্য হাতী ঐ দিকে আছে ভাবিয়া, কাছে ডাকিয়া আনিতে টিফিনের হাতী পাঠাইয়া দিলাম। বধিত হরিণের সতর্কতা লইবার জন্য আমি নিজেই তাহার নিকটে গেলাম। 'পকেট কেস্' হইতে চুরুট বাহির করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলাম। আজ আমার বড় সুখের দিন—স্ফর্ত্তি কিছু বেশী; গাউজ মারিয়াছি, —ছোটখাট নহে—প্রকাণ্ড, তাহার আবার বড় সিংও আছে। ঐ সিং যোড়া অতি সাবধানের সহিত আজও রক্ষিত। উহাই আমার শিকারের প্রথম Trophy।

আমি চুরুটের ধূমে বনভূমি ধূমাইত করিয়া গাউজের পাহাড়ায় নিযুক্ত, এবং এক এক বার সতৃষ্ণ-নয়নে বধিত হরিণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপন মনে আপনি একটুকু আনন্দ অনুভব করিতেছি;—এমন সময়ে সাঁ সাঁ করিয়া অন্য প্রান্ত হইতে অন্যান্য হাতী সহ বাবু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মনে ভাবিয়াছিলাম আজ বাবু না জানি আমার শিকার দেখিয়া কত সুখী হইবেন,—আমার কৃত-কার্য্যতায় কত ধন্যবাদ দিবেন, কতই উৎসাহিত হইবেন।

কিন্তু হায়! ধন্যবাদ দূরের কথা, বাবুর মুখ দেখিয়া আমার আক্কেল গুড়ুম্, আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। তাঁহার মুখ যেন ভাদ্রের ভরা মেঘ। যে মুখ আমি আশা করিয়াছিলাম,—শারদ-চন্দ্রের মত প্রীতিপ্রফুল্ল দেখিয়া কতই রহস্যের কথা পাড়িব, কিন্তু হায়! সে মুখে আজ মলিনতার আশ্রয়; শুভ্র রশ্মির পশ্চাতে অন্ধকারের কালো ছায়া বিরাজমান। যেন চান্দে আজ গ্রহণ লাগিয়াছে। বুঝিলাম—স্পষ্ট অনুমান করিলাম, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হিংসা বাবুকে নিঝুমে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে।

"Oh jealousy! thou bane of pleasing friendship,
Thou worst invader of our tender bosom;
How does thy rancour poison all our softness,
And turn our gentle nature into bitterness!"

Shakespeare.

তিনি আজ আমার শিকার দেখিয়া বেশ্ হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন। কি করেন কিছু না বলাও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, তাই কফ মিশ্রিত ভার গলায় কহিলেন,—"ভালই হইয়াছে, শিকার মন্দ হয় নাই" বাবুর ভাব দেখিয়া ও তাঁহার কথার ভঙ্গিমা শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। মনে মনে কত কি ভাবিলাম, হৃদয়ের মধ্যে যেন একটা দুঃখের তুফান প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল। ভাবিলাম সংসারের একি ব্যবহার! এই বিস্তীর্ণ সংসারের কোথাও কি একবিন্দু প্রেম নাই,—প্রেম কি স্বার্থের বিনিময়? কেহ কি অন্যের দুঃখে দুঃখী হয় না? কষ্টে প্রাণ কাঁদে না? এবং উল্লাসে

প্রীতি উৎফুল্ল হয় না? কেবলি কি সংসারে হিংসা ও ঈর্ষার ওতপ্রোত সংঘর্ষণ? জিঘাংসার দারুণ অট্টহাসি! ন্যায়ের প্রতি অন্যায়ের দ্বেষ, কৃতির প্রতি সাধারণের খড়্গ হস্ততা। দার্শনিক! বৃথা তুমি বলিতেছ "আত্ম সম্মানে মানুষের যত না সুখ, আপনার প্রাণপ্রিয় জনের উপযুক্ত সম্মানে তা হইতেও সহস্র গুণে বেশী সুখ।" কই সংসারে মানুষের প্রাণে এ ভাব ত দেখিতে পাই না। আশৈশব তন্ন তন্ন করিয়া সংসার খুঁজিয়া বেড়াইলাম, সকলেরই মুখে কবির একই কথা—"অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।" বুঝিলাম,—ইহা কেবল কথার কথা, মানুষের উশৃঙ্খল ভাষার এও একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস, এ রহস্যের মূলে, ধূয়ার মন্দির, অথবা জলের রেখা। বাস্তবিক হিংসা ও ঈর্ষার অট্টহাসি লইয়া পৃথিবী অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও সুখ নাই,—মানুষ ভ্রান্তি ও মোহে মজিয়া সময় সময় আত্মহারা হয়। বাবু বন্ধুর প্রতি আমার যতখানি স্নেহ, যতখানি বিশ্বাস, বুঝিলাম তুলনায়, বাবুর প্রত্যাহার বা প্রতিদানের অংশ, অতি ক্ষুদ্র, অতি নীচ। প্রেমিক বলে "প্রেম প্রতিদান চায় না, বেচা কিনা প্রেমের বাজারে নাই, বিনিময় নাই" স্বীকার করিলাম, এ কথা সত্য; ভাল বাসিয়া যত সুখ, ভালবাসা পাইয়া তত সুখ হয় না—অপরকে ভূষণালঙ্কারে সাজাইয়া যে সুখ,—নিজে ভূষিত হইয়া কি তার চাইতে বেশী সুখ? কিন্তু ভালবাসার জনে, ভালবাসা না দেয় কে? তাহাতে যদি কেহ উপেক্ষা করে, উহা প্রাণে বড় লাগে—প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়।

এই সংসারে যাবতীয় পদার্থেই প্রচ্ছন্ন ভাবে অগ্নি বিনিক্ষিপ্ত। চকমকি পাথর, কি বিলাতী দিয়াশলাই ইত্যাদিতে যেমন ঈষদ্ ঘর্ষণে অগ্নিকণা নির্গত হয়, মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে আগুণ অন্তর্নিহিত, তাহাও অবস্থা ভেদে, প্রবৃত্তির ঈষদ্ সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠে। ভিক্ষুকের বুভুক্ষু নিনাদ, দীনের কাতরোক্তি, শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ, আশ্রিতের এবং শিশুর প্রাণ-খোলা সরল ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা অন্তর্নিহিত যে অনল জ্বলিয়া উঠে, তাহার দাহিকা শক্তি নাই, কিন্তু প্রতিভা আছে, সে সিত-স্নিগ্ধ অমিয় আলোকে নরসঙ্ঘ উৎফুল্ল প্রাণে মগ্ন হইয়া থাকে। আর এতদ্ভিন্ন হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে একরূপ নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, সে আগুণের প্রতিভা নাই, কিন্তু দাহিকা শক্তি বিষম, তাহাতে শান্ত হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যায়, বুদ্ধি, বিবেক, আত্ম সম্মান প্রভৃতি সৎবৃত্তিগুলি সশঙ্কোচে, মানব হৃদয় হইতে দূরে সরিয়া পালায়। সে আগুণের নাম—পরশ্রীকাতরতা। হিংসা, ঈর্ষা এবং দ্বেষ এই বৃত্তিগুলি কমবেশ সকলের স্বভাবেই আছে। সংযমী যিনি, তিনি তাহা চাপিয়া রাখিতে কৌশল করেন, আর অকৌশলী উশৃঙ্খল, প্রমত্ত, অর্ব্বাচীন তাহাতে জ্বলিয়া নিজে মরে এবং অপরকেও দগ্ধ করে। দয়া, দাক্ষিণ্য স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সৎগুণনিচয়, যেরূপ মনুষ্য চরিত্রে সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, এবং প্রকাশ পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এই পিশাচবৃত্তি হিংসা তেমন সহজে প্রকাশ পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। ইহার অবস্থা এবং কারণ যেন কেমন একটুকু স্বতন্ত্র রকমের। হিংসা অর্থ ঃ—"চৌর্য্যাদি ঘাতয়োরিতি"—

সুতরাং হিংসুক দুর্জ্জন! "দুর্জ্জন পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্। মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥"
(চাণক্য।)

স্বীকার করি, দুর্জ্জনের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় কিন্তু এ সংসার এমনি প্রহেলিকাময়! ইচ্ছা সত্ত্বেও সে পরিবর্জ্জন বৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। তাহা করিতে গেলে, সমস্ত সংসার খানা বুঝি বা "কম্বলের লোম বাছার" অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহা অপরিহার্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিংসা মনুষ্যের চরিত্র গত বৃত্তি। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই এই বৃত্তিটা কমবেশ বহন করিয়া থাকে। এবং সকলেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহা বিরাজমান কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীজাতির মধ্যে যেন এ বৃত্তির উন্মেষ একটু সমধিক বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরী স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাক—সুন্দরীর নিকট সুন্দরী স্ত্রীর প্রশংসা করিলেত যেন স্বতঃই হিংসার ভাব জাগিতে দেখা যায়—কিন্তু কুৎসিত, কুরূপার নিকট যদি অপর সুন্দরীর প্রশংসা ব্যাখ্যান প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তাহাতেও সে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া থাকে। সে প্রসঙ্গ তাহার প্রীতিকর হয় না, মনঃক্ষুণ্ণ হয়, উপরন্তু নানা কথার অবতারণায় রূপসীর বাপান্ত করিতে ত্রুটী করিবে না। জানি না এ রহস্যের মূলে কি গুপ্ত কারণ নিহিত আছে। চরিত্রবিদ্ ইহার অবশ্যই মীমাংসা করিবেন। যিনি লিখা পড়ার ধার ধারেন, পণ্ডিত বলিয়া গণ্যমান্য, তিনি অনন্য সাধারণকে মূর্খ ভাবিয়া অবহেলার চক্ষে দেখেন; বুদ্ধিমান নিজের জোড়ামিল, এই বিশ্ব সংসারে কুত্রাপিও খুজিয়া পান না; ধনী অন্যের ধন কম

দেখেন, আর আজকাল এই মহামান্য বাঙ্গলা দেশটায় রাজ-প্রদত্ত উপাধিধারী অনেক আছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ, আমার ন্যায় ব্যাধিগ্রস্থ সম্মানিত ব্যক্তি, পাশ্চাত্য বর্ণমালায় সমলঙ্কৃত হইয়া ধরাকে সরা ভাবেন, এবং স্বাধীন মিত্ররাজ্যের সম্মানিতের সহিত একতারে চলিতে ইচ্ছা করিয়া অপরের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টি করিয়া থাকেন। হায়! কি লজ্জা—বাবু যে ছিলাম তাহা এই অল্প দিনের মধ্যে স্মৃতি হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা প্রগল্‌ভতা ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারি! শৈশবে আচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি—

"খাঁটি যদি হবে ভাই!
মাটি ভিন্ন গতি নাই।"

বাস্তবিক কর্ম্মক্ষেত্রে মাটি না হইলে খাঁটি হওয়া যায় না, নিজে নত না হইয়া কে কবে উন্নতিলাভ করিয়াছে, কে কবে বড় হইয়াছে? ফিকিরচাঁদ বলেছে,—

"মানুষ বড় কিসে ভাবি তিন বেলা;
সে ত বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান পেয়ে, না বোঝে পরের জ্বালা।
গাছেতে ফল ধরে যত, নত হয়ে বিলায়, সেত খায় না;
মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে, লাগায় তালার উপর তালা॥"

উল্লিখিত বিষয় অবস্থানিচয়ে-হিংসার উন্মেষ যতটা না,—শিকারীর কিন্তু তা হইতেও কিছু বেশী। পরস্পর শিকারীর মধ্যে হিংসা আরও গুরুতর, ভয়ানক। এক শিকারী ভাল একটী শিকার পাইলে, অপর শিকারীর তাহাতে অসহ্য হিংসা হয়। বিষ-নজরে দেখেন। "পার্টির" মধ্যে কেহ শিকার পান নাই, কি তাহার পাইতে সুযোগ অথবা সুবিধা ঘটে

নাই, তবুও হিংসা কেন অন্যে শিকার পাইল!—স্মরণ হয় এক বার আমাদের সঙ্গে K—নামে একটী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আর গুণ কিছু থাক কি না থাক কিন্তু হিংসা গুণটুকু বিলক্ষণ ছিল। "হাটিতে না জানিলে উঠানের দোষ" তিনি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাঘ শিকারে যাইতে তাঁহার বিলক্ষণ সখ ছিল, লাইনের সঙ্গেও যাইতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাঁহার হাওদার হাতী রাখিতেন অন্য একটী হাতীর পিছনে। কি আশ্চর্য্য! সঙ্গীয় শিকারীর মধ্যে যদি কেহ বাঘ মারিত তবে তাঁহার দারুণ মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইত। হিংসার উদ্রেক হইত, দুঃখিত হইতেন এবং অসুখও বোধ করিতেন। বলিতে কি, সমস্তটা দিন "ভেনর ভেনর" করিয়া তাম্বুস্থ সকলকে উত্যক্ত করিতে কসুর করিতেন না। এবং বলিতেন সকলে বাঘ মারে তাঁহাকে বাঘ মারিতে সুযোগ দেওয়া হয় না! দুঃখের বিষয় তিনি নিজের অক্ষমতার বিষয় ভ্রমেও একবার চিন্তা করিতেন না।

হিংসা পরস্পর সকলের মধ্যেই আছে,—নাই কেবল পিতা-পুত্রে—অধ্যাপক ছাত্রে। পুত্র যদি পিতা হইতে সমধিক পণ্ডিত বুদ্ধিমান, এবং কৃতী হয়, তাহাতে পিতা অতুল আনন্দিত এবং গর্ব্বিত হন। ছাত্র অধ্যাপক হইতে সমুন্নত হইলে, শিষ্য না যতটা সুখী, গুরু ততোধিক পরিতুষ্ট, অনেক স্থলে এমত দেখা গিয়াছে, ছাত্র অধ্যাপকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে অধ্যাপক আত্মহারা হইয়া, প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে ছাত্রকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং স্মিতমুখে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগবানের নিকট

তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। নর-সমাজে এমন মন প্রাণ মত্ততার দৃশ্য আর কিছু আছে কি? কিন্তু হায় কি বলিব, বলিতে দুঃখ হয়—লজ্জায় শির অবনত হইয়া পড়ে, যিনি আমাকে বন্দুক ধরা শিক্ষা দিয়াছেন, কিরূপে শিকার করিতে হয়, তাহা অক্ষরে অক্ষরে উপদেশ দিয়াছেন,—সম্মুখের শিকার নিজে না মারিয়া আমা দ্বারা বধ করাইয়াছেন এবং ঠিকরূপে গুলি বিদ্ধ হইলে অপার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ব্যাধবৃত্তির কি পাশব উত্তেজনা! দুদিন পরে শিকারক্ষেত্রে তিনিই আমার সহিত ঈর্ষা করিতে অনুমাত্র সঙ্কোচিত হয়েন নাই। এই জন্যই বলি সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে শিকারীর মধ্যে এ বৃত্তিটী সমধিক জাগরূক।

আমার বয়স তখন খুবই অল্প—সবে মাত্র কৈশোরের সুকুমার বৃত্তিগুলি, অতীতের কক্ষে রাখিয়া, ধীরে ধীরে যৌবনের উন্মত্ত স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে। পৃথিবীর কুট-কাট কি দ্বন্দ্ব প্রহেলিকার কোন ধার ধারি না, সরলতার শুভ্র আলোক যে দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, অবিচার্য্যচিত্তে সেই দিকেই অগ্রসর হই। কুটিল সংসারের চলন চালনের কিছুই জানি না কি অভ্যস্ত নই; এমতাবস্থায় বাবু বন্ধুর উক্তরূপ ব্যবহারে প্রাণে বড়ই বাজিল। হৃদয়টা যেন হঠাৎ একবারে দমিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে টিফিনের হাতী আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু আমার খাবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই। হরিণটীকে হাতীর উপর তুলিয়া তাম্বুর দিকে হাতী চালাইতে

অভিপ্রায় করিলাম। বেলা তখন অনুমান একটা, চৈত্র মাস দু'প্রহরের দারুণ কাঠফাঁটা রোদ, চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ভয়ানক গরম। রৌদ্রের উত্তাপ যেন মাটি ফাটিয়া বাহির হইয়া হাতীকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। হাতী বেচারী শীতলতার আশায় শুণ্ড দ্বারা ফঁস্ ফঁস্ করিয়া ঘন ঘন তাহার শরীরে বারি প্রক্ষেপ করিতেছে। গাছ, পালা লতা বল্লরী যেন প্রখর রৌদ্রকিরণে অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। গভীর অরণ্য মধ্যে দুই একটী ফুলকুমারী অন্তরাল হইতে লতাগুচ্ছ ভেদ করিয়া সময় সময় শ্রান্ত পথিকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া ক্ষণেকের জন্য একটু শান্তি প্রদান করে, আতপতাপিত নানা রকমের পাখীগুলি সশঙ্কোচে পাতায় পাতায় মিশিয়া নির্জ্জন শীতল স্থানে লুক্কায়িত আছে। বনের সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি অন্যান্য দেব দেবীর পূজায় ত কখনই যাইবে না,—ঐ গুলি সূর্য্যদেবের একচাটিয়া মহালের ধন,— তাই বুঝি তাঁহারই সেবায় ফুল জন্ম সার্থক করিয়া বিশুষ্ক নির্ম্মাল্যে পরিণত হইয়াছে। দিগন্ত সীমা হারাইয়া আকাশ পৃথিবী যেন এক হইয়া গিয়াছে, ভাবের সৌন্দর্য্যে বিশ্ব যেন ডুবিয়া গিয়াছে। আমি আর কি করি—আমিও আমার ভারাক্রান্ত প্রাণটা লইয়া চিন্তার তরঙ্গে উঠাপড়া করিতেছি—আর ভাবিতেছি ইতিপূর্ব্বে —দু'দিন আগে এমনি শিকারের পর, বাবু ও আমি এক হাতীতে চড়িয়া তাম্বুতে আসিয়াছি, কত আমোদ, কত জড়াজড়ি, কত রহস্যের ছড়াছড়ি, প্রাণ খোলা, হাসিরই বা কত বাড়াবাড়ি! কিন্তু আজ বাবু স্বতন্ত্র হাতীতে একা, আমার দিকে দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি অন্য দিকে! হে হিংসা! অপার তোমার মহিমা।

চলিতে চলিতে অনুমান দুটার সময় খুব বড় একটা দীঘীর নিকট আসিলাম, ইহাকে সুতানরার পুকুর বলে। স্থানটী বড় মনোরম, স্নিগ্ধ ও শান্তিপ্রদ। লতা পাতা গাছ গাছড়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায় বোধ হয় যেন প্রকৃতি দেবীর নিভৃত নিকুঞ্জ। স্থানটী অসূর্য্যম্পৃশ্য, সুতরাং শীতল। দীর্ঘীকার উভয় তীরস্থ বৃক্ষাবলীর ছায়া কোণায় কোণায় পড়িয়া কাল কাল রেখা টানিয়া দিয়াছে। আমার ইচ্ছা হইল এই স্থানে একটুকু দাঁড়াই, বিশ্রাম করিয়া অর্দ্ধ ভর্জ্জিত দেহ আর পোড়া প্রাণ দুটাকেই কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া লই। একটা প্রকাণ্ড পলাশ গাছের নীচে হাতী দাঁড় করাইলাম। হাতী ফস্ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল—ফরাজি মিঞা আসিয়া কর-যোড়ে, বিনয়াবনত ভাবে বলিল "মহারাজ বেলা অনেক হইয়াছে, এই স্থানে জল যোগের অনুমতি হয়; অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তাঁবুতে ফিরিতে বিলম্ব হইবে।" আমিও ইতস্ততঃ না করিয়া স্বীকৃত হইলাম। এবং হাতী হইতে অবতরণ করিয়া একটী বৃক্ষের নীচে টিফিনের বাক্সের অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিলাম। বাবুও হাতী হইতে নামিয়া আসিলেন; কিন্তু আজ বুঝি বাগ্‌দেবী বাবুর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্না, তাই জিহ্বাযন্ত্র জড়তা প্রাপ্ত, মুখে কথাটী নাই। কি করি "বোধ হয় তোমার ক্ষুধা বোধ হইয়াছে" বলিয়া আমিই প্রথমতঃ নীরবতা ভঙ্গ করিলাম, বাবু ক্ষীণ-কণ্ঠে "বেলা অধিক হইয়াছে, রৌদ্রের বড় উত্তাপ, ক্ষুধা অপেক্ষা পিপাসার বেগ অধিক হইয়াছে, শীতল জল হইলে বড় তৃপ্তি লাভ করিব" বলিয়া টিফিনে বসিলেন।

বাবু সামান্য কিছু খাইয়া "চোঁ" টানে একগ্লাস পানীয় নিঃশেষ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি ভাবে গাউজটী পাওয়া গিয়াছিল এবং কি রূপেই বা উহা বধ করা হইল। আমি তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা বিবরিয়া কহিলাম। উত্তরে তিনি কিছু স্তম্ভিত, ভীত এবং আশঙ্কান্বিত হইয়া আমাকে কিঞ্চিৎ মৃদুভর্ৎসনায় চরিতার্থ করিলেন। অনেকটা দূরে যাইতে হইবে বলিয়া আমরা ক্ষিপ্রকরে জল যোগ সমাধা পূর্ব্বক হাতীতে আরোহণ করিয়া তাম্বুর অভিমুখে ধাবিত হইলাম। সূর্য্যদেব তাঁহার দিনের খাটুনি খাটিয়া অস্তাচল-শায়ী হইতেছেন, পথেই রাত্রি হইল।

লোকে কথায় বলে "মন্দ সময় একা আসে না", ঘটনা তাহাই হইল। একে প্রাতে গাউজের পাছে কর্ম্মভোগ—তাহার পর বাবুর ব্যবহারে মনটা ব্যথিত, ভারাক্রান্ত; ইহার পর আবার আমাদের পাছে বাঘ;—পশ্চাতে যে হাতীতে গাউজটী ছিল ঐ হাতীর মাহুত চীৎকার করিয়া বলিল; "হুজুর বাঘে হরিণ লইয়া যায়" ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না, হঠাৎ প্রাণ চমকিয়া উঠিল। আমার হাতী একটু দাঁড় করাইয়া উহাকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলাম। হাতী আসিলে দেখি বাস্তবিক হরিণ-শোণিতের গন্ধে এক চিতা বাঘ হাতীর পাছু ধরিয়াছে। লোকের কোলাহলে ও হাতীর শুড়ের ফ্রেঙ্গ-ফ্রেঙ্গ শব্দে চিত্রক একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল; এবং নির্ভীকভাবে হাতীগুলির প্রতি চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল! মনে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি, এ অভিনয়ের এইখানেই যবনিকা পড়িবে, এই শেষ, কিন্তু

নিমিষের মধ্যে পট উদ্ঘাটন হইল। হাতীগুলি যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, তেমনি ঐ দুর্ব্বৃত্ত—দুষ্ট বাঘ আমাদের পিছনে পিছনে পথ ধরিল। করিযূথ ভয়ে জড়সর, অস্থির, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাণ শঙ্কায় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। কি করা যায়, পুনরায়—সকলে মিলিয়া "হৈ-রৈ" চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, বনভূমি নর-কোলাহলে প্রতিধ্বনিত। বাঘের তাহা বুঝি সহিল না, মানের খর্ব্বতা বোধ হইল, তাই শার্দ্দূল রণে ভঙ্গ না দিয়া, যে হাতীতে হরিণ ছিল তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং লম্ফ দিয়া মৃগের বামভাগের কাণের দিক হইতে কতকটা মাংস থাবা দিয়া লইয়া গিয়া একটু দূরান্তরে এক ঝোপের মধ্যে আড্ডা গাড়িয়া বসিল। বাবুর, ব্যাঘ্রের এই দাম্ভিকতা আর সহ্য হইল না, তাঁহার বাঙ্গালী শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চারিজামার হাতী হইতে বন্দুক ও কার্ত্তুশ লইয়া বলিলেন— "এই দুষ্ট বাঘ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপভাবে চলিলে নিশ্চয়ই বিপদের সম্ভব, রাত্রিকাল, তাহাতে গাছ, জঙ্গল, ইহার মধ্যে ভয় পাইয়া হাতীগুলি দৌড়িলে অধিকতর বিপদে পড়িতে হইবে। যা হয়—হইবে, গুলি করি, খুব সম্ভব গুলি লাগিবে না, অন্ধকার, কিন্তু শব্দ শুনিয়া পালাইয়াও যাইতে পারে"—এই বলিয়া চারিটী বড় ছর্‌রার কার্ত্তুশ ও বন্দুক লইয়া, দুইটী বন্দুকে পুরিয়া অপর দুইটী কোর্টের পকেটে রাখিয়া ঠিক হইয়া বসিলেন, এবং যে ঝোপে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বি আশ্রয় লইয়াছিল, উহা ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া উভয় ঘোড়া যুগপৎ টিপিলেন; দুনালে



হাতীর পেছনে নেকড়ে বাঘ—১১৪ পৃঃ

সমভাবে অগ্নি উদ্গার করিল,—আওয়াজ হইল; চিত্রক "হাউং" শব্দ করিয়া জঙ্গলান্তরে লম্ফ দিয়া পলাইল, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। ফরাজি মিঞা এবং কোন কোন মাহুত ছর্‌রা লাগিয়াছে বলিয়া অনুমান করিল। বাবু উহাদের কথায় উৎসাহিত হইয়া ঐ রাত্রেই বাঘ অনুসন্ধানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি নূতন, অপরিপক্ক, বাঘের রক্তের কি যে স্বাদ তাহা এ পর্য্যন্ত পাই নাই—জানিও না; আমার যাইতে সাহস হইল না, বলিলাম "এই আঁধারে ঘেউল বাঘের (wounded) পাছে যাওয়া নিরাপদ নহে, বরং অপরিণামদর্শিতার কার্য্য; ইচ্ছা হয় কাল প্রাতে পিলখানার সমুদয় হাতী সঙ্গে আনিয়া তন্ন তন্ন করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দেখা যাইতে পারিবে; এবং পাইলে বাঘও মারা পড়িবে," বলিয়া তাম্বুর দিকে হাতী চালাইতে আদেশ করিলাম।

খুজি মিঞার হাতী সকলের অগ্রে, তৎপশ্চাতে আমাদের হাতী, অন্যান্য হাতী ইহার পশ্চাৎভাগে। হাতীর পশ্চাতে হাতী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে, কোন সারাশব্দ নাই—নীরব, নিস্তব্ধভাবে—শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। একে বৃক্ষ-লতা সমাচ্ছন্ন বনভূমি, তাহাতে সন্ধ্যার তমসাবরণে প্রকৃতিদেবী আবৃতা। কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না, আকাশ নিস্তব্ধ, জঙ্গল নিস্তব্ধ, সময় সময় দুএকটী মশক পক্ষীর (musquitoe bird) টক্ টক্ শব্দে, হরিণের চীৎকারে ও মাহুতগণের "ধ্যৎ-ছুই-মাইল" বুলিতে, থাকিয়া থাকিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। যখন আমি আর বাবু নীরবে ভাবের খেয়ালে নিমগ্ন,—বাঘের বেয়াদবির বিষয় ভাবিয়া

তন্ময়, তখন হঠাৎ সম্মুখে দীপালোক দেখিতে পাইলাম, আশায় সুরভী বহিল, প্রাণ উৎফুল্ল হইল। ফরাজি মিঞাকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম উহা "মান্দাই পাড়া"—আমরা জঙ্গল অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি, তাম্বু অধিক দূর নয়—এ সংবাদে প্রাণ জুড়াইল, সারাদিনের শ্রমে শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন, এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। দেখিতে দেখিতে আমরা তাম্বুতে পঁহুছিলাম—রাত্রি তখন আটটা বাজিয়াছে।

এ সময়ে স্নান করা সঙ্গত নয় ভাবিয়া ভালরূপে মুখ হাত প্রক্ষালনপূর্ব্বক আহারে বসিলাম, অতি ক্ষিপ্রকরে, যাহা কিছু পারিলাম জঠরে দিয়া, অনল নির্ব্বানান্তর "শয়নে পদ্মণাভ" স্মরণ করিয়া শয্যায় গা ঢালিয়া দিলাম। তাম্বুল সাদর সম্ভাষণ অভাবে ডিবায় শুকাইয়া গেল,—সটকার নল শিবের জটার মত বক্ষে পড়িয়া গড়াইল, আমি নিদ্রায় বিভোর। তখন—

"কোথায় ডুবিল বিশ্ব কোথা চন্দ্রতারা।"

প্রভাতে—কাক ডাকিল, "কা কা কা"; আমার প্রতি ধ্বনি বলে "তোরা কার্য্যস্থানে যা।" বাবু বোধ করি কাক চরিত্র বুঝিতেন, তাই কা কা ধ্বনি শুনিবা মাত্র সকলের আগে রাত না পোহাইতেই উঠিয়া বসিয়াছেন; এবং বাহিরে আসিয়া হাতীর মাহুতের উপর হুকুমজারি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোধ করি নিদ্রার ঘোরেও বাবু—তাঁহার সেই গুলি বিদ্ধ বাঘ, আর জঙ্গল স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। বাবুর কোলাহলে আমার সুখ-সুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন নাই,—বিহগকুল সবে মাত্র

প্রভাতীর প্রথম ঝঙ্কার দিয়া আসর জাঁকাইয়া লইতে উদ্যোগ করিতেছে। আলোক—অন্ধকারে ঘোর দ্বন্দ্ব চলিতেছে; কিন্তু সবলের নিকট দুর্ব্বলের আস্ফালন আর কতক্ষণ?

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অন্ধকার ঠেলিয়া তাঁহার আসনে সমাসীন হইলেন। বাবু। পিলখানায় হাতী আজ আর একটাও বাকী রাখেন নাই, সবকয়টী আনিয়া হাজির করিয়াছেন,—তাঁহার বাঘের শিকারে, আজ সমস্ত হাতী যাইবে। আমাকে সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু—

"আপনি বাঁচলে বাবার নাম।
শ্যাম থাকলে ব্রজধাম॥"

"শরীরে আর কুলায় না" বলিয়া বাবুকে প্রত্যাহার করিলাম। বাবু ফরাজি মিঞাকে এবং শিকারীদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া বীরমদে মত্ত হইয়া চিত্রক বধে যাত্রা করিলেন।

চৌকি ও তামাক পুকুরের পাড়ে আনিতে আদেশ করিয়া আমি পুষ্করণীর দিকে চলিলাম, পুকুরটী প্রাচীন। উহার চারি পাড়েই ফল-ফুলের বাগানের জীর্ণ স্মৃতি বিরাজমান। তন্মধ্যে উত্তর পাড়টী অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও পরিষ্কার। আম, জাম, কাঁঠাল বৃক্ষ প্রভৃতি শ্রেণী বদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। স্থানে স্থানে মল্লিকা, বেল, যূঁই, গেন্দা এবং বকুলের ঝাড়গুলি কুসুম ভূষণে সজ্জিত হইয়া দিনমণির আরাধনায় নিযুক্ত। কোথাও আম্র মুকুল মুকুলিত, কোথাও প্রস্ফুটিত ফুলকুল সৌরভে ভরপুর, কোথাও বা আবার কলিকা নিজভারে অবনত মুখে, বাতাসে—হেলিয়া-দুলিয়া সমাগত পথিককে আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিতেছে। বিধাতা বোধ হয়,

নিঃস্বার্থ প্রেম ও দানের মর্ম্ম জগতে শিক্ষা দিবার মানসে এই ফুল-ফলের সৃজন করিয়াছেন। এমন অকাতর, অযাচিতভাবে দান,—এমন নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রকৃতির মহাগ্রন্থে আর কোথাও খুজিয়া পাওয়া যায় না। হায়! পোড়া সংসার, প্রেম-ময়ের এই আদর্শ, এই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়াও কি তোমার চৈতন্য হয় না? এই বিরাট বিশাল—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা, কি কেবলই স্বার্থ, আত্মসুখ এবং হিংসা দ্বেষের বিষ-বহ্নিতে ভস্মীকৃত হইয়া পিশাচের রঙ্গস্থল হইয়া দাঁড়াইবে? তাই যদি হইল, তবে আর মহতে হীনে, ধনী দীনে পার্থক্য কি? দীনের প্রতি ধনীর ঘৃণা ও নির্দ্দয়তা, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, পীড়িতের প্রতি সুস্থকায়ের নিপীড়ন প্রভৃতি লইয়া যদি সংসার হয়, কিম্বা ধন ও অভিমান যদি ধনীর গর্ব্বের বিষয় হয়, তবে এই সংসারের ত সবই—সং—সার; মূল কিছুই নাই। এই তুচ্ছ—ভঙ্গুর জীবন লইয়া অর্দ্ধ শতাব্দি অতিবাহন করিলাম,—তন্ন তন্ন করিয়া সংসার খুজিয়া বেড়াইলাম, পরার্থে প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, পরস্পরে সহানুভূতি প্রভৃতি কোথাও ত দেখিতে পাইলাম না। কেবল ছলনায়, প্রবঞ্চনায় জগত জড়িত। কপটতা, ঈর্ষাই কি আমাদের অঙ্গভূষণ!

মানব জীবন কর্ম্মময় করিয়া স্রষ্টা সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের করিবার কাজ অনেক আছে, কিন্তু এমনি অপদার্থ আমরা, সে মহৎ কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নানারূপ অকাজ ধরিয়া নীচাশয়ের মত তুচ্ছ বিষয়ের দোষ ধরিতেই সমধিক তৎপর। আর দলাদলি লইয়াই আমরা ব্যস্ত। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে, দলাদলি অপেক্ষা উন্নতি বিরোধী

আর কিছু নাই। দলাদলি সমাজ-বন্ধনে শাণিত কুঠারস্বরূপ। আজ কাল জাতীয় উন্নতির কথা লইয়া দেশময় একটা হুলুস্থুল পড়িয়াছে, উঠিতে বসিতে আমরা জাতীয় মহাসমিতি আর কংগ্রেসের দোহাই দিতেছি সত্য—কিন্তু এদিকে পঞ্চাশ জন মিলিয়া মিশিয়া এক পরিবার ভুক্ত কি এক গ্রামে থাকিতে পারি না;—এক জন একটু প্রতিভা লইয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবার প্রয়াসী হইলে, অপর দশ জনে চাপিয়া রাখিতে পারিলে, তাহাকে মাথা তুলিতে না দিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, সে বিষয় কি আমরা একবারও চিন্তা করি? ভেত বাঙ্গালীর বল বিক্রম, এ ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, অপরাপর বিষয়ে যদি ইহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ পাইত তবে দেশের এবং সমাজের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত, সুখ শান্তি সমধিক বৃদ্ধি পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। নিরক্ষর কি ইতর শ্রেণীর মধ্যে যদি কেবল এই প্রথা নিবদ্ধ থাকিত, তাহাতে সমাজের বড় কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈর্ষা, হিংসা এবং দলাদলি লইয়া শিক্ষিত এবং বিজ্ঞলোকও জড়িত, সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে তাঁহারাও ছাড়িয়া কথাটি কহেন না। জাতীয় উন্নতির মূলে একতা, এই কথা যতদিন না লোকের জ্ঞান হইবে, যতদিন না ইহার সংস্কার হইবে, তত দিন দেশের উন্নতি আশা সুদূর পরাহত।

আমি একটী বকুল গাছের নীচে চৌকিতে বসিয়া সট্‌কা হাতে লইয়া পুকুর পাড়ের শোভা-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি। পুকুরটী পানা ও দলদামে সমাকীর্ণ, মধ্যে মধ্যে

পুষ্করপলাশকুল আকুল হৃদয়ে বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বসন্তের—প্রভাতী মলয় অবসাদে দক্ষিণ দিক হইতে ফুর ফুর করিয়া মৃদুমন্দ বহিয়া বৃক্ষের ঘন পাতা নাড়িয়া, ফুল ফল, লতা দুলাইয়া, পুকুরের পানা দাম দল মৃদু আন্দোলিত করিয়া জীবের প্রাণে এক সুখশান্তি ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। কোকিল "কুহু-কু" চীৎকারে বনভূমি মুখরিত করিয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া বসিতেছে। প্রকৃতির রম্য পটে যেন সকলই নব ভাবে মিশ্রিত, নব রসে পূরিত। কোকিল-কোকিলার প্রণাদ, মধুপ কুলের উন্মাদ ঝঙ্কারে, সারাবিশ্ব যেন আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। এই বসন্তে জীবমাত্রেই প্রফুল্ল, তন্মধ্যে প্রজাপতি এবং ভ্রমরের দল বুঝি একটু বেশী রসিক, তাই তাহারা উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে এ ফুল হইতে ও ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু পান করিতেছে। ভ্রমরের দল অতিরিক্ত চঞ্চল, উশৃঙ্খল এবং তরল প্রকৃতির, এই জন্যই শাব্দিক তাহার "ভ্রম" লক্ষ্য করিয়া বুঝি "ভ্রমর" অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই বোধ হয় যেন ভ্রমরের ভ্রম প্রতি পদে। মধু ও অমধু তাহার বোধ নাই,—ফুল দেখিলেই সে ব্যাকুল—সেখানেই তাহার "গুণ গুণ।" প্রজাপতির দল আম্রমুকুলে যাইয়া মধুপান করিতেছে। মধুমক্ষিকার ঝাঁক তাহার পেছনে ভন্ ভন্ করিয়া তাল ধরিয়াছে—অকস্মাৎ কোথা হইতে অরসিক ভ্রমর আসিয়া তাহাদিগকে তাড়া দিয়া বিদায় করিল এবং গোলাপী নেশায় হেলিয়া দুলিয়া নানারঙ্গে মৃদু মধুর বসন্ত বাহারে তান ধরিয়া আস্তে আস্তে পদ্মিনীর নিকট যাইয়া

প্রেম-বিস্তার করিতে লাগিলেন। রবির প্রণয়-ছবি নলিনী লাজ-নম্র সতী লক্ষ্মীটির মত উদ্বেলিত প্রাণে বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া ভ্রমরের রসিকতায় দু একবার আপত্তি করিল কিন্তু ভ্রমর ছাড়িবার নয়—পদ্মিনীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যেই সূর্য্যদেব, আরক্ত রঞ্জিত রাগে পূর্ব্বাসার দ্বার খুলিয়া উকি মারিলেন, ভ্রমর ভয় বিহ্বল প্রাণে ভোঁ শব্দে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। এই সময় শ্রদ্ধাস্পদ জয়দেবকে স্মরণ হইল—হায় জয়দেব! তুমি চলিয়া গিয়াছ, সে আজ দুই সহস্র বৎসরের কথা, কিন্তু তোমার গাথা আজও স্মৃতিরপটে উদ্বোধিত!

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমংসখী বিরহি জনস্য দুরন্তে॥"

আমি ত এইভাবে কাব্যরস পানে বিভোর—দশটা বাজিয়া গিয়াছে, স্নানের সকল প্রস্তুত, ভৃত্য আসিয়া তাহার কর্ত্তব্য ভেরীর ধ্বনি শুনাইয়া গেল। বাবু তখনও ফিরিয়া আসেন নাই। ঐ মনেরমত স্থানটা ছাড়িয়া যাইতে আমার মন চাহে না, কিন্তু কি করি? গত কল্যও স্নান হয় নাই; শরীর অপবিত্র ও অপরিষ্কার বোধ হইতেছে। সুতরাং স্নান আহারের জন্য তাম্বুতে আসিতে বাধ্য হইলাম।

আমি যখন স্নান তৎপর, বাবু তখন ধীরে ধীরে আসিয়া তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। তাহার আসিবার সংবাদ পাইয়া মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে

পারিলাম না। অবিলম্বে আর্দ্রবস্ত্রেই বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া বাঘের সংবাদ জানিবার জন্য আকুল হইলাম। তিনি চিত্রকের পরিবর্ত্তে তিনটী "হরিকেল" (Green pigeon) পক্ষী দেখাইলেন, এবং ব্যাঘ্র শিকারের নাতিদীর্ঘ ভূমিকার সমাপান্তে বলিলেন,—বিশেষ সতর্কতার সহিত জঙ্গল ভাঙ্গা হইয়াছিল, ব্যাঘ্রের অনুসন্ধানেও কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু কোথাও তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। যখন নিরাশ মথিত প্রাণ লইয়া, তাঁহারা তাম্বুতে ফিরিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এই কপোতত্রয় পাওয়া গিয়াছে। আমি পাখী তিনটী দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। অতি সতর্কতার সহিত উহা রাত্রের আহারের জন্য রাখিতে ভৃত্যকে উপদেশ দিয়া পুনরায় আমি স্নানাগারে প্রবেশ করিলাম।

আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে নিজ কাজ কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, তৎপর বাড়ীতে কয়েকখানা পত্র লিখা হইল। অপরাহ্নে প্রাত্যহিক নিয়মাবদ্ধ সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইলাম। বিবি ও কুইনী কুক্কুরী দ্বয় আমার সঙ্গে চলিল। বাবুও সমভিব্যাহারী হইলেন। পা চালি করিতে করিতে চিত্রক সম্বন্ধে নানা কথাই হইল, আলাপে স্পষ্ট বুঝিলাম বাঘ না পাইয়া বাবু বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি হয়ত মনে ভাবিয়াছিলেন, জঙ্গলে যাইয়া মুমূর্ষু বা মৃত ব্যাঘ্রই অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু কি দুঃখ, তাঁহার সে আশা আকাশ কুসুমে পরিণত হইল, তিনি কুত্রাপি ব্যাঘ্রের পদ চিহ্নও প্রাপ্ত হন নাই, বড়ই কষ্টের বিষয়। আমিও তাঁহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া একটু দুঃখিত হইলাম। এবং প্রবোধার্থে

বলিলাম "নিরাশ হইও না" শিকারের জন্য মনে দুঃখ করিতে নাই। লোকে বলে—"মার্নে ওয়ালাসে বাচানে ওয়ালা জবরদস্ত হ্যাঁয়"। অতএব মন প্রসন্ন কর—

"আজিকে বিফল হল,
হতে পারে কাল।"

"Never mind, better luck next time, cheer up old chap" বলিয়া পিল্‌খানার দিকে চলিলাম।

হাতী দেখিয়া আসিতে একটুকু বিলম্ব হইল। তাম্বুর পার্শ্বে একখানা আরাম কেদারা স্থাপিত ছিল;—শয্যা দেখিলেই যেমন মানুষের বিশ্রাম মনে পড়ে, আরাম চৌকি দেখিয়াও তেমনি আমার আরামের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল; এবং উৎফুল্ল প্রাণে আমার পঞ্চ ভৌতিক নশ্বর দেহ উহাতে স্থাপন করিলাম। হুকা প্রস্তুতই ছিল, নলটী টানিয়া লইয়া সজোরে ইঞ্জিন চালাইলাম, মুখচিম্‌নি হইতে অনবরত ধূম নির্গত হইতে লাগিল। কাল প্রাতেই আনুইরাজারবেড়ে যাইতে হইবে, ভৃত্যগণকে পোট্‌লা পাট্‌লী বাঁন্ধিতে আদেশ করিলাম।

অমাবস্যার রাত্রি না হইলেও ঘোর গভীর, অন্ধকার নিশি; অসংখ্য তারকা আকাশে উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাদের রশ্মি অন্ধকার ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া পশ্চিম কোণে বিদ্যুৎছটা চমকিত হইতেছে। সোঁ-সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে। বাবু আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন কি ভয়ানক অন্ধকার;— "সে অতি ঘোরা যামিনী"—আমি তাহার পরের চরণ ধরিয়া আরম্ভ করিলাম—"নিবিড় গাঢ় তমস্বিনী।

"পৃথ্বী ঝিল্লিরুত মারুত ব্যাপিনী,
বিহগগণ ধ্বনি বিধ্বংসিনী,
চক্রবাক সমূহ ধ্বনি,
প্রতি যামে যামে জাগ্রৎ
ভট কঠোর চীৎকার ধ্বনি ॥"

বাবু আমার স্মৃতিতে একটু বিস্মিত হইলেন। এ অনেক দিনের কথা,—একটী কথকের নিকট শুনা; এখন আর মনে নাই। বাবু আঁধারে থাকিতে নারাজ, তাই তিনি অন্ধকারের বিভীষিকা বাড়াইয়া আমাকে বলিলেন—"চলুন, উঠুন, তাম্বুর মধ্যেই যাই, এখন আঁধারে বসিয়া আর কাজ নাই।" বাবু প্রাচীন বন্ধু, তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি না। বিশেষতঃ রাত্রিও ১০॥০ সাড়ে দশটা, আহারেরও সময় হইয়াছে। বাবুর শিকারলব্ধ হরিকেল পাখী অতি সুস্বাদু ও উপাদেয় বোধ হইয়াছিল।

———o———

সপ্তম প্রস্তাব।

আন্নুইরাজারবেড় শিবির—ময়মনসিংহ।

বন্ধুবর শয্যা ত্যাগ করিয়া তাম্বুর বাহির হইলেন, তাঁহার ডাকাডাকী হাকা হাকীর চোটে "আড্ডাস্থ", সমুদায় লোকের সুখ-সুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেল। দূরস্ত গ্রাম তখনও সুপ্ত। নিশি ব্যবচ্ছেদ এবং ঊষার উন্মেষ, এই দুয়ের মধ্যে তখনও একটা জটিল সমস্যা বিদ্যমান। কুলায় বিহগকুল নীরব ;—কেবল জঙ্গলের ধারে, অনতিদূরে এক প্রান্তে, থাকিয়া থাকিয়া দু'একটী শ্যামা পাখী মৃদু কণ্ঠে ঊষার পূর্ব্বাভাষ কীর্ত্তন করিয়া প্রভাতী জ্ঞাপন করিতেছে। আকাশের গায়ে তারকা সমূহ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু নিভে নাই। বিটপনিচয় তখনও গাঢ় অন্ধকারে সমাবৃত। পূর্ব্ব গগণের উপরিভাগ অতি সামান্য ভাবে ধূসর। নিম্নস্তর ঈষৎ সিন্দুরে রঙ্—একেবারে লাল হইতে তখনও একটুকু বিলম্ব আছে।

হাতী,—প্রভাতী বায়ে হেলিয়া-দুলিয়া দ্বিতীয় শিবিরা-ভিমুখে ছুটিয়াছে। পথে দুই একটী কৃষক লাঙ্গল ঘাড়ে গরু লইয়া ডাবা হুকায় তামাক ফুকিতে ফুকিতে শিশির ভাঙ্গিয়া জড় সড় হইয়া আস্তে আস্তে মাঠের দিকে চলিয়াছে ;

মাঘ মাসের শেষ, দেখিতে দেখিতে ধরণী দেবী তিমির বসন উন্মোচন করিয়া রঞ্জিত বসনে পরিশোভিতা হইলেন। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য দেব দেখা দিলেন।

ইতিমধ্যে বহু মাঠ, বহু গ্রাম এবং বহু জঙ্গল পাছে ফেলিয়া আমাদের হাতী অনেকটা দূরে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। শান্ত পূর্ব্বাহ্ন, শীতল বাতাস, কন্ কনে শীত। বাবু একটী প্রভাতী গান ধরিলেন,—আমি মোটা কাপড়ে জড়াইয়া, কাণ দুটা বাবুর গানের দিকে দিয়া, প্রাণটা লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। তখন আমাদের হিন্দু-সমাজের উপর দিয়া, সংস্কারের একটা মন্থর তরঙ্গ ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছিল। ভাবনা, গভীর ভাবনা, কিসে বাঙ্গালী মানুষ হয় ইত্যাদি। উন্মাদ কল্পনায়—হিমালয় হইতে ভারত মহাসাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে পশ্চিমে আফগান স্থান পর্য্যন্ত, সমস্ত ভারতবর্ষটা যেন আমার মাথার উপর ওলোট পালট করিতেছিল। কল্পনার ছিন্ন সূত্রগুলিকে যত্ন সহকারে একত্র গ্রথিত করিয়া হাতীর গদীতে বসিয়া একচিত্তে ভাবিতেছি কিরূপে এই সমাজের সংস্কার সাধিত হইবে,—কি রূপে এই জাতী উন্নত হইবে। এমত সময় এক পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল; "হির্—হির্—আয়—আয়" * এই মধুরধ্বনি কাণে প্রবেশ মাত্র আমার চমক ভাঙ্গিল, মাথার উপর যে ভারতসমাজের বোঝাটা ছিল তাহা সরিয়া পড়িল, আমার মহাযোগ ভাঙ্গিয়া গেল। যত্ন গ্রথিত কল্পনার সূক্ষ্ম

---

* সাধারণতঃ, হাঁসকে "তৈ-তৈ"; কুকুরকে "তু-তু" প্রভৃতি যেমন সাঙ্কেতিক ভাষায় আহ্বান করা হয়, সেইরূপ, পূর্ব্ববঙ্গাঞ্চলে,—ছাগ-ভেড়াকে "হির-হির" বলিয়া ডাকা হয়।

সূত্রগুলি ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন হইয়া মহা শূন্যে মিলাইয়া গেল। কর্ণ পটহে কেবলই বাজিতে লাগিল "হির্-হির্—আয়-আয়।" সুকণ্ঠ হইতে ঐ শব্দ নিঃসৃত হইতেছিল;—প্রত্যূষের শান্তি ভেদ করিয়া ঐ মধুর শব্দ বায়ুর সঙ্গে অনন্তে মিশাইয়া গেল। জানি না কোন্ মায়াবী দেবতা, সুন্দরীর কণ্ঠে ঐ "আয় আয়" শব্দ বিনিসৃতঃ করিয়া আমার মহাযোগ (স্বদেশ চিন্তা) ভাঙ্গিয়া দিলেন। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য বড় ঔৎসুক্য জন্মিল। বেশ, ভালরূপে দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন পূর্ব্বক ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলাম, অনতি দূরে এক কদলি কুঞ্জের মধ্যে, ক্ষুদ্র যষ্টি হাতে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী দণ্ডায়মানা, সুন্দরী যুবতী,—কৈশোর কালের সীমা অতিক্রম করিলে যে স্বর্গীয় মধুরিমা দেহকে সমাচ্ছন্ন করে ও হৃদয়কে প্রফুল্ল করে, এই যুবতীর সেই আনন্দকাল উপস্থিত। যুবতীর সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ, অপাঙ্গ, ওষ্ঠ, নয়ন, বদন, নিতম্ব, কুন্তল এবং বাহু ইত্যাদি প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক যেন কাণায় কাণায় পূর্ণ; জোয়ারের—ভরা মন্দাকিনী! সে রূপ দেখিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না, সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশা মিটে না, আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না। যুবতী শৈশব—যৌবনের অর্দ্ধোস্ফোটনোম্মুখী নব গোলাপ ফুলের ন্যায় আপন সৌন্দর্য্যে আপনি গৌরবিনী।

"She looks as clear as morning roses, newly washed with dew".

সুকেশী গৌরাঙ্গিনী;—পরিধানে নীল রঙ্গের শাড়ী। নীল ও গৌরবর্ণে যে মত সামঞ্জস্য হয়;—অন্য আর কোন রঙ্ সেরূপ মিশে না। পূর্ণচন্দ্র সুন্দর—নীলাম্বরে চন্দ্র উদয় হয়

বলিয়াই উহার সৌন্দর্য্য জগতে ফুটিয়া পড়ে। শ্যামল সরোবরে পদ্ম বিকশিত হয় জন্যই উহার সৌন্দর্য্যে সরোবর উদ্ভাসিত হয়। এই গৌরাঙ্গিণী যুবতী নীল বসন পরিহিতা বলিয়াই এত মধুরে—মধুর।

যুবতীকে দেখিয়া তৃপ্তি হয় নাই! আর কিছুকাল দেখিবার জন্য উদ্ব্যস্ত! হাতী সমান গতিতে চলিতেছে, ইচ্ছা একটু দাঁড়াইয়া গেলে ভাল হয়। চুরুট ধরাইবার ছলে—পকেট হইতে দেয়াশালাই বাহির ব্যপদেশে হাতী একটু দাঁড় করাইয়া চুরুট ধরাইলাম সত্য; কিন্তু আশা মিটিল না। পুনরায় দিয়াশলাইর বাক্সটা হাতী হইতে ভূমে পড়িয়া গেল,—অভিপ্রায় উহা আহরণে একটু সময় পাওয়া যাইবে, কিন্তু হায়! শকুন্তলার বসনাগ্র বেতস কণ্টকে ছিড়িয়া গেল ঠিক—কিন্তু শকুন্তলা পালাইয়া গেল! সেইরূপ আমার আশা ফলবতী হইল না, কারণ পেছনের জিনিশপত্র বাহী হাতীগুলি আসিয়া পহুছিল। বিদ্যুৎ যেমন মেঘে লুকায়, মৃদু কটাক্ষে সুন্দরীও কুটীরের মধ্যে চলিয়া গেল। আমরাও রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে ধীরে ধীরে তাম্বুর দিকে চলিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম, লোকে যে বলে যত্নে রক্ষিত উদ্যান কুসুম তুল্য বনকুসুম সুন্দর হয় না ইহা কি সত্য? ইহা কি সম্ভবপর?

বাবুর সঙ্গে নানাবিধ গল্পগুজব করিতে করিতে এবং কতকগুলি পাখী শিকার করার দরুণ, রাস্তায় একটু বিলম্ব হইয়াছিল। তাম্বুতে যখন আসিলাম তখন অনুমান বেলা ১১টা; প্রখর রৌদ্র। কিরূপ স্থানে তাম্বু সংস্থাপিত করা

হইয়াছে দেখার বড় ইচ্ছা হইল না। স্নানাহারের বন্দোবস্ত ঠিক করিতে ভৃত্যদিগকে আদেশ দিয়া ;—সর্ব্বশ্রমসংহারিণী তাম্রকূট দেবীর সেবায় মনোনিবেশ করিলাম। অবিলম্বে বাবু জামা যোড়া ছাড়িয়া, "উলঙ্গ শরীরে" উদর ভাসাইয়া স্বতন্ত্র একটী কেদারায় গা ঢালিয়া দিলেন। "চিলুম" আসিল। বাবু অতি নিষ্ঠুরভাবে হুকার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। বেচারী হুকা উৎপীড়িত হইয়া ঘর ঘর শব্দে চীৎকার করিয়া ঐ স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। স্নানাহার করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তৈজস পত্র ইত্যাদি সহ ভৃত্যগণ পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। আহারাদি করিয়া বিশ্রাম লাভ করা হইল।

চারিটা কি সাড়ে চারিটার সময় তাঁবুর বাহির হইলাম ও একটী আম্র বৃক্ষের ছায়ায় দরবার সাজাইয়া বসিলাম। মাঘ মাসের শেষ,—অপরাহ্ন, সুমধুর বসন্ত অনিল বহিয়া চারিদিকে আনন্দধারা ছড়াইতে লাগিল! নবোদ্গত আম্রমুকুলের সুগন্ধে তাম্বুর চতুর্দ্দিক মাতিয়া উঠিয়াছে। মুকুলে মুকুলে ভ্রমর কুল আবেশে আকুল হইয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বেড়াইতেছে ; ইত্যাদি বন সৌন্দর্য্য এক মনে নিরীক্ষণ করিতেছি। এমত সময় গ্রামের কতিপয় আবাল বৃদ্ধ প্রজা আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে আমার এক বৃদ্ধ মোড়ল প্রজাও আসিয়া "সেলাম ঠুকিল।"

দু-একটী কথাবার্ত্তার পর মোড়ল সাহেব, বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—এ স্থানে তাম্বু নির্দ্দেশ করাটা বড় ভাল হয় নাই, কারণ এই স্থানটি নিরাপদজনক নয়, বরং

অতিশয় ভীতি-পূর্ণ! সন্ধ্যার পর এখানে কেহ আসিতে পারে না, কত শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি শুনা যায়। যে বার গোপাল মণ্ডল মারা পড়ে সে বৎসর গড়ের ও পার হইতে একজন প্রজা আসিয়া এই স্থানে বাড়ী করার বন্দোবস্ত লয়, কিন্তু সে ভূতের উপদ্রবে এখানে থাকিতে পারিল না। তাহার বাড়ী ঘর একরাত্রে বেড়ের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি চীৎকার করিয়া পলাইয়া যায় ইত্যাদি। অন্য এক ব্যক্তি বলিল—"জানেন না এক দিন সন্ধ্যার সময় উজান পাড়ার একটী বালক এখানে আম পাড়িতে আসে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারিয়া ফেলে" ইত্যাদি গল্প আমি বড় তেমন একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলাম না, বরং একটু বিরক্তিই অনুভব করিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীয় লোকজনের মধ্যে একটা ভয়ানক ত্রাস জন্মিয়া গেল। তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, এমন কি, দু একজন আসিয়া আমার কাছে সেই আতঙ্কের কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইল না। সন্ধ্যা হইয়াছে—তখন অন্য বন্দোবস্ত আর চলে না, বাধ্য হইয়াই সেখানে থাকিতে হইবে বলিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বিদায় করিলাম। মোড়ল সাহেব "হুজুর হুশিয়ার" বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল; ভাবে বোধ হইল তাহারও বিদায়ের অভিপ্রায়।

দরবার ভঙ্গ করিয়া আমরা ভগ্ন রাজবাড়ী দেখিতে বাহির হইলাম। যে জায়গায় আমাদের তাম্বু খাটান হইয়াছে, ইহা "আনুই রাজার বেড়" বলিয়া খ্যাত। কিম্বদন্তী, পূর্ব্বকালে "আনুই রাজা" নামক এক জন রাজা এ অঞ্চল শাসন

করিতেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়—অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমি তাঁহার কোনরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। রাজ বাড়ীর চারিদিক পরিখায় বেষ্টিত, পরিখার পার্শ্বে বিস্তর আম, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট ও চাঁপা বৃক্ষ সমাকীর্ণ। বাড়ী ভগ্নাবশিষ্ট, একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে লাগিলাম।—হায়! এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা, কেন সংঘটিত হয়! কেনই বা এই সংসার সৃষ্টি মহাধ্বংসের কোলে মিলাইয়া যায়;—কেনই বা চক্রবৎ এই জগৎ সংসারটা ঘুরিতেছে! দিবার পর রাত্রি, শুক্ল পক্ষের পর কৃষ্ণ পক্ষ, যৌবনের পর জরা, জন্মের পর মৃত্যু ইত্যাদি নিত্য আবর্ত্তিত হইতেছে ইহার কারণ কি? যে আন্দুই রাজার বাড়ী হয়ত এক দিন জন কোলাহলে পরিপূরিত ছিল,—কত উৎসব আনন্দে জনপদমুখরিত হইত,—কত দেশ বিদেশাগত, বিদ্বন্মণ্ডলী, শিল্পি, গায়ক ইত্যাদির আনন্দ ভূমি ছিল! হায়! আজ সব কোথায়? কালের ফুৎকারে সব কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! যাঁহার সৈন্য পদ ভরে একদিন, আন্দুহাদি, ইনাইতপুর, রাঙ্গামাটিয়া প্রভৃতি স্থান বিকম্পিত হইত, যে অসি-হেতিদের সুতীক্ষ্ণ অসির দীপ্তিতে লোক চক্ষু ঝল্সিয়া যাইত, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে দেব গৃহ প্রতিধ্বনিত হইত, যে স্থানে প্রহরে প্রহরে নহবতের মধুর বাদ্যে দিক দিগন্তের জীবদিগকে প্রবোধিত করিত, আজ এই সকল কোথায়! যে রাজবাড়ী এক দিন ধর্ম্ম কর্ম্মের আদর্শ স্থান ছিল, যে স্থানে সৎগুণ সম্পন্ন মহাত্মাদের লীলাভূমি ছিল, আজ এই পরিবর্ত্তনের ধ্বংস

মুহূর্ত্তে ঐ চত্বর কুকার্য্য নিরত ঘৃণিত স্বভাব পিশাচগণের নিত্য তামসিক বিলাসভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে প্রাসাদে রাজা-রাণী ও তাঁহাদের পরিজনবর্গ আনন্দে বাস করিতেন, আজ সেই প্রাসাদ, সেই কক্ষ বন্য জন্তুর আবাস স্থানে পরিণত হইয়াছে। কবি গাহিয়াছেন—

"কত যে কি খেলা তুই খেলিস ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যাঁর ইচ্ছা বলে
বৈজয়ন্ত-সমধাম এমর্ত্ত্য নন্দনে
শোভিল? হরিল কে সে নরাপ্সদ দলে,
নিত্যযারা, নৃত্যগীতে এ সুখ সদনে,
মজাইত রাজমনঃ কত কুতূহলে,
কোথা বা সে কবি যাঁরা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুল পুঞ্জ ধরি পুটকরে)
পূজিত সে রাজ পদ? কোথা রথী যত
গাণ্ডীবী সদৃশ যাঁরা প্রচণ্ড সমরে?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি? তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত, নিরন্তর যে মত সাগরে
চলে জল, জীবকুলে চালাস সে মত।"

কালের কাণ্ড কারখানা লইয়া আমি ঘোর চিন্তামগ্ন। বাবু বাড়ীটী ভাল করিয়া দেখার উদ্দেশ্যে আমাকে আর একটুকু অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া আমি পুনঃ পুনঃ আপত্তি উত্থাপন করিলাম। সন্ধ্যা কাল—ভগ্ন মন্দিরে সর্ব্বদা সর্পভয়, কিন্তু বাবুর আগ্রহাতিসয্যে

একটু অগ্রসর না হইয়া পারিলাম না। অতি সন্তর্পণে পাদক্ষেপ করিতে লাগিলাম। এবং অল্পক্ষণেই ভগ্ন প্রাসাদের সম্মুখীন হইলাম। দেখিলাম—প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে জলনিঃসরণ জন্য সুন্দর অথচ প্রশস্ত পাকা জল প্রণালী। স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রস্রবণের চিহ্ন; তাহারা ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া অতীত চিন্তা করিয়া মলিন হইয়া যাইতেছে। আর ঐ সকল স্থানে যে সু-সজ্জিত উদ্যান ছিল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ধন গৌরবের পরিচয়-অন্তপুরের দিকে এক সুগভীর পুষ্করিণী তাহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টক দ্বারা দৃঢ়রূপে বান্ধান। এই সমস্ত দেখিতেছি—এমত সময় হঠাৎ অন্তপুরের একটী ভগ্ন কুঠরীর দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল।—দেখিলাম, দুটি জ্বল-জ্বলায়িত চক্ষু আমাদের দিকে স্থির ভাবে লক্ষ্য করিয়া আছে। জানোয়ারটা কি ঠিক ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এক কদম পাছে হটিলাম—অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বাবুকেও দেখাইলাম, দৃপ্ত চক্ষু দেখিয়া বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ভীতির ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি একজন গ্রাম্য প্রাচীন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওটা কি হে?" লোকটা বড়ই ব্যস্ততা সহকারে কহিল—"হুজুর ও উজার বাড়ী কত বাঘ ভাল্লুক থাকে—রামার ছেলে আম কুড়াইতে এক দিন অপরাহ্নে এখানে আসিয়াছিল, একটা বৃহৎ বাঘের তাড়ায় দৌড়াইয়া সে প্রাণ বাঁচায়। বাবু কথাগুলি অতি শঙ্কিতভাবে আদ্যোপান্ত শুনিলেন, এবং মুহূর্ত্তমাত্র আর ঐ স্থানে অপেক্ষা করা উচিত নয় বলিয়া আমাকে পশ্চাৎপদ হইতে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতে

লাগিলেন। কিন্তু আমি নূতন শিকারী, শিকারেই আমার আনন্দ, ভীরুতা আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, পাবে যে সে আশাও কম। এক ছোক্‌রার হাতে বন্দুক ছিল, বন্দুক তাহার নিকট হইতে লইয়া, সঙ্গে দুইটী কুকুর ছিল—উহার জিম্যায় রাখিয়া একটু অগ্রসর হইয়া উক্ত জন্তুর প্রতি ভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। জানোয়ারটার হাব-ভাবে বেশ বোধ হইল যে আমা দ্বারায় তাহার নির্জ্জন শান্তির বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে। এবং ইতস্ততঃ পাদবিক্ষেপে তাহার ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। বাবু আমাকে বলপূর্ব্বক ফিরাইলেন—আমরা সামান্য পশ্চাৎপদ হইয়াছি, তখনি একটা বৃহৎ "গন্ধ-গোকুল" দৌড়, প্রাণের দায়ে দৌড়, দৌড়িয়া বিস্তৃত পরিখার জলে পড়িল এবং সন্তরণ করিয়া অপর পারে যাইতে চেষ্টা করিল। আমি শিকারী—কাছ হইতে শিকার পলাইয়া যাইবে ইহা কখনও প্রাণে সহিবে না। এক লম্ফে পরিখার পারে ঘুরিয়া বন্দুকের ঘোড়া টানিলাম,— "গুরুম" ; অধিক্ষণ আর অপেক্ষা করিতে হইল না ; শিকারটি জলে ভাসিয়া হাবু-ডুবু করিতে লাগিল—তাহার ভব লীলা ফুরাইল। আমি সন্ধ্যার ঘোরে একবার পিলখানা দেখিয়া তাম্বুতে আসিলাম।

তখন গাঢ় সন্ধ্যা !—শান্তির আশায় তাম্বুতে বসিলাম ও বন্ধুবরের সহিত নানা বিষয় আলাপ জুড়িয়া দিলাম— কিন্তু শান্তি কোথায় ? সঙ্গীয় লোকজনেরা ভূতের কাহিনী শুনিয়া, হৈ-চৈ, আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, কেহ বলে ঐ আগুন, ঐ কান্না, ঐ বিভীষিকা ! ইত্যাদি চীৎকারে আমি

বিরক্ত হইয়া গেলাম। পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে নীরব হইতে বলাতেও যখন তাহারা অধিকতর উদ্বিগ্ন, তখন ঠিক বুঝিলাম, আমা হইতে তাহাদের ভূতের ভয় প্রবল; সুতরাং আমাকে নিরস্ত হইতে হইল। আহারান্তে নিজ তাম্বু প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলাম। তখন হাঙ্গামার মাত্রা, ক্রমেই বর্দ্ধিতাবস্থায় পরিণত। হঠাৎ এক ব্যক্তি বলিল,—"হুজুর ঐ শুনুন রাজ বাটীর দিকে কান্না শুনা যাইতেছে" বিষয়টা কি দেখার জন্য বাবুকে সঙ্গে করিয়া একটুকু অগ্রসর হইয়া, বাস্তবিকই কিরূপ একটা "কান্দ-কান্দ" শব্দ শুনিতে পাইলাম। রাত্রিকাল আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না, তাঁবুতে ফিরিয়া শয়ন করিলাম। আমার বেশ নিদ্রাও হইল। কিন্তু সঙ্গীয় লোকগুলির আর নিদ্রা অদৃষ্টে ঘটিল না। পরস্পর ঐ ভূতের কাহিনা ঘাড়ে করিয়া ব্যস্তবাগীশের দল অনিদ্রায়ই সমস্ত রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

ব্রহ্মার সৃষ্টি মধ্যে যদি শান্তি থাকেত আছে নিদ্রার নিভৃত ক্রোড়ে। ব্যথিত, পীড়িত, শোকার্ত্ত, ক্লান্ত, ও আমাদের ন্যায় পথশ্রান্ত জীব নিদ্রিতাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক বিরাম পাইয়া সমস্ত কষ্ট ও যাতনা অনায়াসে বিস্মৃত হয়। "নিদ্রাতুরাণাং নচ ভূমি শয্যা" এই কথার তাৎপর্য্য যে নিদ্রিতের জন্য অট্টালিকা বা সুচারু শয্যা আবশ্যক করে না। তাহার জন্য গহন গিরিকন্দর, নির্জ্জন কানন ভেদাভেদ নাই। এই নিমিত্ত নিদ্রা দেবীকে শান্তি দেবী আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। স্নেহময়ী নিদ্রাদেবী পথ শ্রান্ত নূতন শিকারী যুগলকে আপনার সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী সুকোমল

কোলে টানিয়া কতই বা সুখ স্বপ্ন দেখাইতে লাগিলেন। দেখিলাম—সেই পর্ণকুটীর, সেই কদলি কুঞ্জ। সেই নীলাম্বর শোভিতা গৌরাঙ্গিণী, বক্র গ্রিবায় লোল নয়নে দণ্ডায়মানা। আর শুনিলাম, সেই "হির্-হির্ আয়-আয়" শব্দ; পুনরায় দেখিলাম সেই দ্রুত বেগে কুটীরে প্রবেশ। এইবার যবনিকা পতন। অদূরে মাহুতগণ—"বট-বট ছাই-ছাই" শব্দ করিয়া আমার সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল—শয্যা ত্যাগ করিলাম।

প্রকৃতি দেবী বালার্ক সিন্দুর কপালে মাখিয়া, ধীরে ধীরে কুজ্ঝটিকা রূপ ঘোমটা টানিয়া,—পথিক ও পল্লিবাসী-দিগকে যখন, একে একে মাঠ, ঘাট, এবং পথ-প্রান্তর দেখাইতে লাগিলেন, তখন আমরা হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক শিকারে বাহির হইলাম।

আমি এবং বাবু এক "চারিজামায়" বসিয়া, জড়সড় অবস্থায়, নানাবিধ খোশ গল্পের তরঙ্গের উপর সময় তরণী ভাসাইয়া,—পল্লী হইতে মাঠ, মাঠ হইতে জঙ্গল, এবং জঙ্গল হইতে বিল, পারি দিয়া ক্রমে ক্রমে গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতেছি। বিলটী সচ্ছ সলিল পূর্ণ! সরিৎ বক্ষে কুমুদ, কমল কহ্লার ফুল, স্থানে, স্থানে, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিশোভিত,—কোথাও মালার মত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সুসজ্জিত! কোথাও স্ফুটো মুখ, কোথাও বা অল্প অল্প ফুটিয়াছে, কোথাও সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া আপন সৌরভে আপনি মোহিত। মৃদুল পবন সেই জলোচ্ছ্বাসের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ এবং মদোন্মত্ত। স্থানে স্থানে স্থির জলে,—জল কুসুম প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। বিল-বক্ষে—জলপিপী, বক, এবং কালেম প্রভৃতি নানা

জাতীয় পাখী বিক্ষোভচিত্তে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের কলরবে সরিৎ বিস্তার মুখরিত। প্রাতঃ সমীরণ উৎপল গন্ধে প্রমোদিত। স্থানটী অতি মনোরম এবং শান্তিপ্রদ।

আমরা যখন বিল অতিক্রম করিয়া পাড়ে উঠিয়াছি, অনতিদূরে দেখিতে পাইলাম একটী বৃহৎ গোখুরোসাপ, জল হইতে উঠিয়া, অতি দ্রুতবেগে একটা ঝোপের মধ্যে পালাইয়া যাইতেছে। মাহুতগণ, অতিশয় সতর্ক লোক, তাহাদের চক্ষে সবই পড়ে,—তাই "হাপ-হাপ" বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক নিজ-নিজ হাতীকে সতর্ক করিল। দু-এক জন, হাতী হইতে নামিয়া সেই বিষধরকে আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু আজ তাহার বৃহস্পতির দশা তাই সে অক্লেশে দৌড়িয়া পালাইল; এ যাত্রা রক্ষা পাইল। খুজি—ফরাজী মিঞা ইহাকে অতি শুভ যাত্রা মনে করিল, এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"হুজুর! আজ যখন হাপ দেখ্‌ছি তখন যাত্রা বালা, খুব জানোয়ার মিলবে।" জানিনা—ঐ সাপের দ্বরুণই হউক, কিম্বা ফারাজি সাহেবের তজ্‌বিরের বলেই হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে এই দিন শিকার প্রচুর মিলিয়াছিল।

আমরা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম,—আমাদের দক্ষিণ দিকে একটা সিক্ত স্থান,—স্থানটী প্রচুর তারাবনে সমাকীর্ণ; টিফিনের হাতী এবং তাহার সঙ্গে আর কয়েকটী হাতী যেমনি ঐ তারাবনের মধ্যে প্রবেশ করিল,—অমনি একটা প্রকাণ্ড শেলা বাঘ, শশব্যস্তে ঐ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একেবারে দুই লম্ফে শিকারীদের হাতীর সম্মুখে

উপস্থিত, কেবল উপস্থিত নহে, শিকারীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া, লেজ উচু করত দৌড়াইয়া অন্য এক জঙ্গলে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমরা নূতন শিকারী সুতরাং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সংকল্প স্থির যে বাঘের উপর, বন্দুক ধরিব না। কারণ নূতন শিকারীর পক্ষে উহা নিরাপদজনক নয়। কিন্তু শিকারীদিগকে উত্তেজিত করিতে ত্রুটি করিলাম না। দেখিলাম তাহারা আমাদিগ হইতেও কিছু অতিরিক্ত রকমের পারগ। যোগাড়, যন্ত্র করিয়া, বন্দুক উত্তোলনের অনেক পূর্ব্বেই ব্যাঘ্র বাহাদুর বন্দুকের পাল্লার অতীত স্থানে যাইয়া পুনঃ পুনঃ আমাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। শিকারীগণ খুব চোটচাপটে তাহাদের হস্তী প্রধাবিত করিলেন; কিন্তু ফলে পণ্ডশ্রম মাত্র সার। শিকারীরা ঐ সম্বন্ধে যে সমস্ত কৈফিয়ৎ দিলেন, এবং যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলিলেন,—আমি কিন্তু বুঝিলাম বাঘ দেখিয়া তাহাদের পঞ্চাত্মা শুকাইয়াছিল। তাহারা ঘাবড়াইয়াছিল।

বেলা যখন ৭ কি ৭॥ টা, তখন অতিকষ্টে ঘন কাঁটাবন, বাইদ, বাইদের পর চালা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আমরা প্রকৃত শিকার ভূমিতে উপস্থিত হইলাম। আমি বাবুর হাতী হইতে আমার নিজের হাতীতে আসিলাম এবং বন্দুক হাতে লইলাম। আমাদের "Field marshal" ফরাজী সাহেবের হুকুম মতে হাতীর লাইন দাড়া করা হইল, ও শিকার উদ্দেশ্যে হাতী সকল ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

হরিণ, গাউজ এবং অন্যান্য শিকার প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টি-

পথে পতিত হইল সত্য, এমন কি,—পলাশ ও আমলকী গাছের নীচে ৫, ৭, ১০টি করিয়া হরিণ ও গাউজ দেখা গেল। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ না করা হইয়াছিল এমত নহে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের শিকারেব দক্ষতার গুণে হউক কি হরিণের অদৃষ্ট জোরে হউক একটীও ক্ষত কিম্বা আহত হইয়াছিল না। ফরাজী সাহেব তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, তাহার শ্বেত শ্মশ্রু নাড়িয়া বন্ধুবর এবং অন্যান্য শিকারীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"হরিণকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেও না "মারবে ঘোড়ার ডিম" হরিণ যখন দৌড়ায় তখন মারলে লাগবে কেন? লাভের মধ্যে—আওয়াজ করিয়া তোমরা কেবল বনের শিকার চমকাইয়া দিতেছ;—এরূপ করিলে কখনও শিকার পড়িবে না,"—দৌড়ের শিকার যে মারা আমাদের কাজ না, এ জ্ঞান আমাদের মধ্যে কাহারও তখন ছিল না, সুতরাং ফরাজী সাহেবের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সকলে আবার শিকার উদ্দেশে ছুটিলাম।

তখন প্রখর রৌদ্র—ছায়ার আশায় একটা বিশাল বট গাছের তলায় একটু অপেক্ষা করিলাম, এমন সময়, "শিকার বয়" ঐ গাছের উপর কয়েকটী "হরিকেল পাখী" (Green pegion) অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাকে দেখাইয়া দিল। যেমন দেখান, অমনি বন্দুক উঠাইয়া ছোড়া, গুরুম্-গুরুম্; দুটি নাল খালি করিলাম।—যথালাভ;—সকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল পণ্ডশ্রম, কেহই কিছু শিকার করিতে পারেন নাই, আমি তবু দুটী পাখী মারিলাম;—জনার্দ্দন তৃপ্তির

একটুকু সামান্য যোগাড়ও হইল। ইতিমধ্যে অন্যান্য হাতী আসিয়া উপস্থিত হইল। আর বিশ্রাম করার সময় নাই; তাহাদের অনুসরণ করিলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে, এক বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।—মাঝে-মাঝে "টঙ্গ" অর্থাৎ বন্য জন্তুর অত্যাচার হইতে শস্য রক্ষার জন্য কৃষকগণের অস্থায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর বিশেষ। রাত্রিতে কৃষকগণ এই "টঙ্গে" পাহাড়া দেয়; দিনেরও অনেকটা বেলা এই "টঙ্গেই" ঘুমায়। এই সকল দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি,—সহসা পার্শ্বস্থ একটী ঝোপ হইতে একজন কৃষক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া অতি ব্যস্তভাবে আমাদের নিকটে আসিয়া,—আমরা যেন তাহাদের শস্যক্ষেত্র না মাড়াইয়া যাই তজ্জন্য নির্ব্বন্ধাতিসহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। হায়! অজ্ঞ কৃষক! তুমি জাননা, কি বুঝনা যে আমি রাজাই হই আর মহারাজাই হই, আর যাই হই, আমিও মানুষ; এক ক্ষেত্র হইতেই ভগবান তোমার এবং আমার খাদ্য উৎপন্ন করিয়া দিতেছেন।—কৃষককে আশ্বস্ত করিয়া, নিকটে কোথাও ভাল জলাশয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক অদূরে একটী ঝরণা দেখাইয়া দিল। আমরা ঝরণা লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে আমরা লতা গুল্ম পরিশোভিত এক কুঞ্জের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম।—স্থানটী বড়ই সুন্দর। উহার কিয়দংশ শ্যামল দূর্ব্বাদলে চায়নার উৎকৃষ্ট কোমল মখমলের শয্যাকে লাঞ্ছিত করিতেছিল। নীচে একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, কুল-কুল মধুর নিনাদে, যেন আমাদের

মত পিপাসাতুরগণের সান্ত্বনার জন্য বিমল বারির স্নিগ্ধ প্রবাহ খুলিয়া তরতর ভাবে বহিয়া যাইতেছে।

আমরা এখানে হাতী হইতে নামিলাম, এবং ঐ কুঞ্জের ছায়াতে একটু বিশ্রাম করিয়া "টিফিন" অর্থাৎ জলযোগে মনোনিবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জঠরানল নির্ব্বাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শিকার প্রসঙ্গে একটু রহস্য চলিল। ফরাজী সাহেবের কেরামৎ বিষয়ও যে না উঠিয়াছিল এমত নহে। ইত্যাদি অনেক কথার পর, বন্ধুবর এবং শিকারী দ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিলাম,—"এত হরিণ, এত সাম্বর এমন কি শার্দ্দূলাদি পর্য্যন্ত আজ পাইয়াও শিকার কেহ কিছু করিতে পারিলে না,—আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি তবু দুটী পাখী মারিয়াছি।" এ রহস্যে বোধ হইল, বাবু একটু রুষ্ট হইলেন। কারণ তাঁহার চক্ষে মুখে সে অবস্থাটা আমাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল। জলযোগান্তে, নির্ঝরিণীর শীতল জল পান করিয়া শরীর অনেকটা ঠাণ্ডা হইল। আর কাল বিলম্ব না করিয়া আবার শিকার অন্বেষণে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বাহির হইলাম। বড় বেশী দূরে যাইতে হইল না। বেলা প্রায় দুটা—অনতিদূরে দেখা গেল শাল গাছের ঝোপের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড সাম্বর দণ্ডায়মান। গাউজটী শৃঙ্গধারী। আমার হাতী হইতে ২০-২৫ হাত দূরে। আমি মাহুতের গা টিপিয়া হাতী দাঁড় করাইতে ইঙ্গিত করিলাম। হাতী অতি সন্তর্পণে স্থির হইয়া দাঁড়াইল বেশ ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ধরিলাম, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শিকারটী "পপাত ধরণীপৃষ্ঠে" আমি নূতন শিকারী—আমার আনন্দ অসীম—

ভাবিলাম কৰ্ম্ম ফতে। গাউজ তাহার মৃগলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এই ভাবনা আমাকে অধিক ভাবিতে হইল না, আমার এই আকস্মিক আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে দেখি যে গাউজ মহাশয়ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সচকিতে চাহিয়া ঁা দৌড়। আমি অপটু শিকারী তখনও জানিতাম না যে—পতিত শিকারের উপর আর একটী গুলি করিলে ভাল হইত। শেষের শ্রমটা না করিয়াই পারিতাম।

সাম্বর ত চলিয়া গেল—আমি অবাক হইয়া "কিংকৰ্ত্তব্য-বিমূঢ়" অবস্থায় চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু প্রশংসাকারী মাহুতের—ধন্য তার প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি! সে তখনই টপ্ করিয়া হাতী হইতে নামিয়া যেখানে হরিণ পড়িয়াছিল সে স্থানে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল প্রচুর রক্ত,—ঐ রক্ত রেখা লক্ষ্য করিয়া কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া হস্তীতে উঠিল, এবং রক্ত চিহ্ন ধরিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। আন্দাজ অৰ্দ্ধ কি তিন পোয়া মাইল পথ ব্যবধানে যাইয়া দেখি হরিণটী একটা ঘনীভূত ঘাসবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—রক্ত চিহ্নে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান। আর কোথাও রক্ত দেখা গেল না। মাহুত বলিল এই জঙ্গলেই হরিণ আছে। ফলেও তাই, যেমনি হাতী ঐ ঘাসবনের মধ্যে প্রবেশ করিল, অনতিদূরে ঘাসবনের মধ্যে স্পষ্ট হরিণের পিঠের কতক অংশ আমি দেখিতে পাইলাম। আমি অতি সতর্কতার সহিত তাহার মেরুদণ্ড লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম,—গুলি মেরুদণ্ড ভেদ করিয়া অস্থি চূর্ণ করায় হরিণ ঐ স্থানেই পড়িল। কিন্তু "যার ছেলেকে কুমিরে খায়, সে মোটা

ঢেঁকি দেখিয়াও ভয় পায়” কি জানি যদি আবার পালায়—নিকটে গিয়া আর একটী গুলি করিলাম। মাহুতগণ আনন্দে ও উৎসাহে “আল্লা—আল্লা” ধ্বনি করিয়া বনভূমি প্রতি-ধ্বনিত করিল। একটী ছোকরা ছুরি লইয়া জবাই করার উদ্দশে যেমনি হরিণের সম্মুখে উপস্থিত, অমনি পতিত হরিণ এক লাথি, লাথি খাইয়া ছোকরা অন্যূন ১০, দশ হাত দূরে ছিটিয়া পড়িল। হরিণ তখনও মরে নাই, মেরু ভাঙ্গার দরুণ অঙ্গাবশ হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র।

এমন সময়, বাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং কাষ্ট হাসি দ্বারায় মনের উষ্ণতা জ্ঞাপন করিতেও ত্রুটি করিলেন না। তখনও হরিণটা মরে নাই—কাতরনয়নে ঢল ঢল ভাবে চারি দিক দৃষ্টি করিতেছিল, আর একটী গুলি মারিয়া উহার যন্ত্রণা নিবারণ করার জন্য বাবু আমাকে বারম্বার অনুরোধ করাতে,—আমি, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলাম। বন্ধুবর, হরিণের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। হরিণ নিশব্দ অচেতন। অচিরে হরিণটিকে হাতীতে তুলিয়া শিকার উদ্দেশে পুনরায় রওয়ানা হইলাম।

পাশাপাশী ভাবে, বাবু এবং আমি নানাবিধ গল্প করিয়া যাইতেছি। এমত সময় একটী শূকরা হরিণ আমাদের সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছিল। বাবু তাহার বন্দুক তুলিয়া ক্রমে দুইবার আওয়াজ করিলেন, গুলি অগ্র পশ্চাৎ ভাবে প্রেরিত হওয়ায়, হরিণের শরীর বিদ্ধ হইল না। হরিণটী দৌড়িয়া আমার হাতীর দক্ষিণদিকে যেমনি লম্ফ দিয়া পড়িল;—অতি ক্ষিপ্রকরে—ধাঁ করিয়া চারি নম্বরের ছররা

উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম,—তখনি যেন এক দৈবশক্তি-প্রভাবে আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ওলট-পালট খাইয়া হরিণটী পড়িল। দৌড়ে হরিণ মারা বড় শক্ত, বিশেষ উহা নূতন শিকারীর কার্য্য নহে, বিলক্ষণ দক্ষতার প্রয়োজন। আমি সেই দৌড়ের হরিণ মারিলাম, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে—একটুকু স্পর্দ্ধাও জন্মিল। তাবৎ দিন বাবু ও শিকারীদ্বয় বহু আওয়াজ করিয়াছেন কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আমি ক্রমে দুটী—শেষেরটীত বিশেষ দক্ষতার সহিতই মারিলাম, বক্ষস্ফীত হইবারই কথা। কিন্তু মূলত কেন যে এরূপ হইল—আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কোথায় লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং কি ভাবে ছর্‌ড়া মাথায় বিদ্ধ হইয়াছিল, তৎসময়ে যদি কেহ আমাকে এই ফাঁকি করিত,—তাহা হইলে যথাযথ উত্তর দিতে পারিতাম কি না সন্দেহের বিষয় ছিল। কিন্তু উপযুক্ত "ওস্তাদের তালবেলাম বলিয়া" এবং বহু শিকার করিয়া পরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া "বাঘুয়া রাজা উপাধি" * পাইয়াছি তাহার বিবরণ পরে লিখা যাইবে।

ক্ষিপ্রহস্তে, আমাকে দুইটী হরিণ মারিতে দেখিয়া বাবু স্তম্ভিত হইলেন; অন্তরে না হউক, মৌখিক আমাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া পার্‌লেন না। ঐ হরিণটীও হাতীতে তুলিয়া,—পুনরায় লাইন করিয়া শীকার অন্বেষণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে বাবুও একটী সুন্দর জাইত হরিণ (Hogdeer) মারিলেন। তাহার মেঘাবৃত

* আমি বহু ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছি, এবং ব্যাঘ্র শিকারেই আমার আনন্দ, এই জন্য, দেওয়ানগঞ্জ হইতে আসাম পর্য্যন্ত লোকে, "বাঘুয়া রাজা" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

বদনে একটু বিজলী চমকিল! আমিও তাঁহার স্ফূর্ত্তি বাড়াইবার জন্য, যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলাম। আমরা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বাইদে পড়িলাম। বাইদ পাড়ী দিয়া উঠিতে একটী তারাবন; যেমন ঐ বনে হাতীর প্রবেশ— সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বাঘ। বাঘ দেখিয়াই "বাঘ-বাঘ" বলিয়া চীৎকার করিলাম, কিন্তু আমাদের চেঁচানি শুনে কে? শিকারীদ্বয় তাহাদের হাতী একটী ঢোলাইনের (Female Sumbar) পিছনে ধাবিত করিয়াছে, সুতরাং আমরাও তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। ব্যাঘ্রটির গ্রহ সুপ্রসন্ন, তাই, উচ্চ পুচ্ছে বনান্তরে পালাইয়া গেল। যাইতে যাইতে আমরা পথিমধ্যে তাহাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া অনুমান করিলাম শিকারীরা যখন আওয়াজ করিয়াছে— নিশ্চয়ই শিকার পড়িয়াছে। কার্য্যতও তাহাই, আমরা যাইয়া দেখি, শিকারীদ্বয় বধিত হরিণ লইয়া আমাদের অপেক্ষা করিতেছে।

আমরা পঁহুছিয়াই ঐ হরিণটী হাতীতে তুলিয়া লইলাম। অদ্যকার শিকার প্রচুর! সকলের মনই প্রফুল্ল, সকলই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইয়াছে, একেবারে বঞ্চিত কেহই হয় নাই। ফরাজী মিঞারও আজ ভারি স্ফূর্ত্তি, কারণ, তাহার ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। বেলা প্রায় অবসান, শিকার ক্ষান্ত দিয়া, গোধূলি লগ্নে আমরা তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম। হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে, যখন সকলে বিশ্রাম করিতেছি তখন একব্যক্তি আসিয়া গত রাত্রের ভৌতিক কান্নার রহস্য উদ্ঘাটন করিল যে, উহা আর কিছুই নহে, হত গন্ধগোকুলের ছানা

কয়টী। হতভাগ্য শিশু তাহাদের অসময়ের সহায় মা হারাইয়া ঐরূপ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছে মাত্র।

"Peace is the happy, natural state of man,
War is corruption,—his disgrace."

খুব সকাল সকাল, শুইয়াছিলাম, তাই রাত থাকিতেই ঘুমভাঙ্গিল। বাবুও জাগ্রত হইয়াছেন,—অল্প অল্প অন্ধকার আছে, বিছানায় পড়িয়া, অর্দ্ধ-শয়নে উভয়ে খানিক গল্প করিলাম। পাখীগুলি কলকল করিয়া এডাল হইতে ওডালে যাইতে লাগিল, ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উকি মারিলেন, বাবু গাইলেন,—

"অয়ি সুখময়ী উষে,
কে তোমারে নিরমিল",—

দেখিতে দেখিতে উষা দেবী তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সহাস্য বদনে অবনীতলে জ্যোতি ছড়াইয়া দিলেন, দিগ্ উদ্ভাসিত হইল। প্রভাত বায়ু পুষ্প সৌরভ বহন করিয়া, তাম্বুর বাতায়ন পথে লুকাচুরি খেলিতে লাগিল। আমরা তাঁবুর বাহিরে আসিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তর "চা" সেবন করিয়া, পরিখার পাড়ে একটী বড় এবং সুবিস্তৃত আম গাছের নীচে আড্ডা করিয়া বসিলাম। আজ আমাদের বিশ্রামের দিন। আজ আর শিকারে বাহির হইব না। নানাবিধরূপ গল্পের প্রবাহে শান্তির তরণী ভাসাইয়া একটী একটী করিয়া যখন সুখের ঢেউ গণিতেছি, বাবু তখন বলিলেন, "গতকল্য যে নীলাম্বরী পরা যুবতীটি দেখিয়াছিলেন জানেন ওটী কে? আমি বলিলাম—"ঐটী বন কুসুম, বন ফুল

কেচ্ছা।

রমজান উলমুলক নামে এক বাদ্‌সা ছিলেন। আরব সাগরের মধ্যে এক প্রকাণ্ড দ্বীপে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত—বড় সুশাসন, তাঁহার আমলে প্রজাগণ বড় সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। দেশময় শান্তি বিরাজিত। চোর চৌর্য্যবৃত্তি ছাড়িয়া ভাল গৃহস্থ হইয়াছিল,—দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। বাদসাহের প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জলপান করিত। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। ছেলে ছিল, সে ফকির হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পৌত্রের উপর রাজ্যের শাসনভার পড়িল। কিন্তু পৌত্র রাজ্য পরিচালনে বিশেষ যোগ্যতা দেখাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না। প্রকৃতিপুঞ্জ উশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, গতিকেই প্রজাবৃন্দ অসন্তুষ্ট ও একান্ত অতৃপ্ত হইয়া উঠিল,—এ দিকে, শিল্পকার শিল্পি ছাড়িল, ব্যবসায়ী ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অনুপায়ে রাজসেবায় প্রবর্ত্ত হইল। প্রজামণ্ডলী সম্পূর্ণরূপে রাজার মুখাপ্রেক্ষী হইয়া পড়িল। কিন্তু রাজা সকলের পোষণে অশক্ত, গতিকেই, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজায় প্রজায় ভয়ানক অসদ্ভাব চলিতে লাগিল। অভাব এবং অভিযোগে রাজ্যময় একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

"জহরমল" নামক এক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত, দেশের এই দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া কিরূপে ইহার কল্যাণ সাধন করা যায়, কি কৌশলে লোকচক্ষু উন্মিলিত হয়, এবং কি উপায়ে জনসাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়—ইত্যাদি চিন্তা করিয়া এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিলেন, এবং সময় উচিত ভাষায়

সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন ;— "হে সম্মানিত সভ্যমণ্ডলী, গত রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। সম্মুখে আমাদের ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, এবং সঙ্কট হইবার সম্ভব। আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, আমাদের নূতন বাদসা রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া এবং প্রজাসমূহের দুঃখ মোচনে অশক্ত হইয়া তিনি এই যুক্তি স্থির করিয়াছেন যে, এই রাজ্য সেনাপতির হাতে অর্পণ করিয়া পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করিবেন, অর্থাৎ ফকির হইয়া বনে যাইবেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য কিছুই রাখিয়া যাইবেন না। তাঁহার নগর পরিত্যাগের পূর্ব্বে, সমস্ত ধ্বংসে পরিণত করিয়া যাইতেছেন। স্বপ্নান্তে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি স্বপ্ন যথার্থ,—টিকা জ্বালিয়া তামাকু সেবন করিব, সেই দেয়াশলাইর বাক্স নাই, আলো জ্বালিবার লেম্ফ নাই, লিখিব দোয়াত নাই, কলম নাই, আপনাদের নিকট আসিব এমন সাজ পরিচ্ছদ নাই, জল খাইবার পেয়ালা নাই, ভোজন করিব পাত্র সরঞ্জাম নাই, মোট কথা, নাই বলিতে কিছুই নাই। এক নিঃশ্বাসে সব গিয়াছে, শূন্য ঘর পড়িয়া আছে, আমরা মাত্র এই স্থূল দেহটি লইয়া আছি। এখন উপায় কি ? নিজেদের চেষ্টা নিজে না করিলে আর ত প্রাণ বাঁচে না। নিজের পায় যাহাতে নিজেরা নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারি ও সম্বল যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা দেখা সর্ব্বেব কর্ত্তব্য।

আমাদের জীবন না হয় একরূপে যাইবে, কিন্তু পরবর্ত্তিগণের কি হইবে, তাহার চিন্তা আবশ্যক। তাহার প্রতিকার

আপনিই বনের নিভৃত প্রদেশে প্রস্ফুটিত হয়, আবার আপনিই নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে ঝরিয়া পড়ে। জান ত নারীজাতি আর বিজলী কবিজনের তুল্য উপমার সামগ্রী; বস্তুতই স্ত্রীলোক, ঠিক বিদ্যুতেরই মত! ইহাদের দর্শনে,—"রমে আঁখি", আর পর্শনে—"মরে পুরুষ জাতি," ছেড়ে দাও ভাই! যুবতীর কথা! ঐ নৈবেদ্য যাঁহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহারই সেবায় লাগিবে।" বাবু একটুকু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ঐটী আর কেহ নহে,—আমাদের খুজি ফরাজী মিঞার কন্যা।"

আমরা যখন এই সব গল্প করিতেছি, গ্রাম হইতে বিস্তর লোক তামাসা দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইতে লাগিল। লোক কোলাহলে ঐ বনভূমিময় একটা "হল্লা" পড়িয়া গেল। মানুষের কি প্রকৃতি! মানুষই মানুষকে শান্তি ভোগ করিতে দেয় না। তাহারাও মানুষ আমরাও মানুষ, ইহার মধ্যে দেখিবার কি আছে? দূর দূরান্তর হইতে এখানে আইসার তাৎপর্য্য তাহারাই বুঝিতে পারে। এ'ত আর প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌সের সমাগম নহে; অভ্যর্থনাও নহে,—যে রাস্তা-ঘাট সুসজ্জিত হইবে, কেডেটকর্‌পস্ "Cadet corps" আসিবে, তুরুক সোয়ারের মিছিল ছুটিবে, আর সহর আলোকমালায় বিভূষিত হইবে। আমরা শিকারী অতি সামান্য ভাবে, গুটিকত বস্ত্র-গৃহ, কতিপয় গরুর গাড়ী, গোটাকত হাতী আর বেশীর মধ্যে গুটি দুই বিলাতী কুকুর। ইহার ভিতরে দেখিবার এমন কি আছে! বাবুকে রহস্য করিয়া বলিলাম "ওহে! ভাল করিয়া তোমার

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখত, যেমনটী ছিলে, ঠিক তাহাই আছ, না এই রাত্রের মধ্যে কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ; তাহা না হইলে ইহারা কি তামাসা দেখিতে আসিল ?" বাবু হো-হো করিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিলেন।

কিছুতেই লোকের ভিড় কমে না। ক্রমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কি করি! ভ্রূকুটি বিস্তার করিলে রাজবিধির গৌরব হানি করা হয়। নীরবে, বিরক্তির সহিত ঐ জনতার যাতনা ভোগ করিতেই হইল। বেলা যখন বারটা অতীত হইতে চলিল, তখন লোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিতে লাগিল। রৌদ্রের প্রখর তাপ! চারিদিক ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে, পাখীগুলি ঝোপের মধ্যে ও পাতার আড়ালে বসিয়া নানারূপ আলাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে,—হাতীগুলি নিজ নিজ "চাড়া" (আহারীয়) পৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিতেছে, আর গ্রীষ্মাতিশয্যে পুনঃ পুনঃ শুঁড়ের দ্বারা ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিজ নিজ দেহে জল সেঁক করিতেছে। ভৃত্য আসিয়া আহার্য্য প্রস্তুত বলিয়া সংবাদ দিল,—আমরাও গাত্রোত্থান করিলাম।

বিশ্রাম নিমিত্ত যেমন আমরা তাম্বুর ভিতর গিয়াছি, বাহিরে আবার কোলাহল শুনা গেল। অনুসন্ধানে জানিলাম, ধীবরগণ মাছ ধরিবার জন্য আমার নির্দ্দেশ অনুসারেই তথায় জাল লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুগভীর পরিখায় প্রচুর পরিমাণে মৎস্য,—নিজের ব্যবহার এবং মাছ ধরার তামাসা দেখার উদ্দেশেই গ্রামান্তর হইতে জালিয়া আনান হইয়াছে। আমরা পরিখার পাড়ে সেই আম গাছের তলে উপবেশন করিলাম, সরঞ্জাম ঠিক করিয়া জালিয়ারা "ক্ষেও"

ফেলিল, এক ক্ষেপেই এত অধিক পরিমাণে মাছ উঠিল যে, আর দ্বিতীয় বার জাল ফেলিবার প্রয়োজন হইল না। ঐ জলাশয়ের মৎস্য নিকটস্থ প্রজা এবং অপর সাধারণের প্রধান খাদ্য ছিল। পূর্ব্বে শিকার প্রস্তাবের আরম্ভে একস্থানে বলিয়াছি যে "আমার জীবনের সাধনাই কড়া ক্রান্তি লইয়া" এখানে সে কথার সার্থকতা একটু প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করিয়া উক্ত প্রকাণ্ড জলাশয়ের উপর "কর" বসাইলাম। বাৎসরিক কিঞ্চিৎ আয়ের পথ উদ্ঘাটিত হইল। শিকার স্থলে আমি এমন অনেক বৈষয়িক ব্যাপারে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকি। ইহাও আমার এক শিক্ষা। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক জমীদার সন্তানেরই মফস্বল ভ্রমণ উপলক্ষে এইরূপ নীতি অবলম্বনে উপকার সাধিত হইতে পারে। দিনে দিনে আমাদের যে অবস্থায় পদার্পণ করিতে হইতেছে; এবং ক্রমশঃ ব্যয় বাহুল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, বাদ্‌সাই চাল চলন ছাড়িয়া, এই সব উপায়ে, ন্যায় ভাবে, কিছু কিছু আয় বাড়াইতে পারিলে মন্দ কি? জমী পতিত আছে,—জমা নাই; এ মহত্ত্ব এবং উদারতার আমি কখনই পক্ষপাতী না। যাউক সে কথা! নিজেদের ব্যবহার উপযোগী মৎস্য রাখিয়া, উদ্বৃত্ত মৎস্য সমাগত প্রজা এবং অপর সাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। এই ব্যাপারে ৩টা কি ৩॥০টা বাজিল। আমরা সামান্য জল-যোগ করিলাম। গ্রামের কতিপয় মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং অতি আগ্রহের সহিত গতকল্য রাত্রের বিষয় অর্থাৎ আমরা কি ভাবে ছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। ভূত কর্ত্তৃক গত রাত্রে আমরা কোনরূপ বিভীষিকা

দেখিয়াছি কি না,—সয়তান দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছি কি না এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু যখন উত্তরে অবগত হইল যে, আমরা বিলক্ষণ শান্তিতে ছিলাম, কোনরূপ কিছু কাণ্ড কারখানা হয় নাই; তখন মোড়ল বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাবে বলিল,—"রাজ রাজাকে যখন জঙ্গলের বাঘে পর্য্যন্ত ডরায়, তখন আর ভূতে না ডরাইবে কেন!"

আমরা ধীরে ধীরে সেই ভগ্ন রাজপুরী অভিমুখে চলিলাম, কাল যে পথে জঙ্গলের জন্য অগ্রসর হইতে কষ্ট বোধ হইয়াছিল, প্রতিপদে সর্প আশঙ্কা ছিল, হাতীর পায়ে আর লোক পদ ক্ষেপণে, আজ সে পথ সম ভূমি। হায় রে মনুষ্য সমাজ! এই সংসারে তোমরাই বনে বাজার বসাও, আবার তোমরাই বাজারকে বনে পরিণত কর। হায় মানুষের মন! এই পরিবর্ত্তনের চঞ্চল মুহূর্ত্ত কিরূপে আসে, কি ভাবে যায়,—তার কোন খবর কেহ রাখ কি? আজ আমরা বেশ নিঃশঙ্কভাবে সমস্ত বাড়ীটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার রাক্ষসের মত আমাদিগকে তাড়া করিতে আরম্ভ করিল। আমরা তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম। আহারান্তে ফরাজী মিঞাকে তলব দিয়া আনান লইল ও একটী কেচ্ছা শুনাইয়া আমাদের জ্বলন্ত প্রাণটাকে একটুকু সান্ত্বনা করিতে আদেশ করিলাম। শিকার-ভূমে, সেই জঙ্গলের মধ্যে, ফরাজী মিঞাই আমাদের সভা-পারিষদ। বস্তুতঃ ফরাজী সাহেব বেশ ভাল ভাল উপন্যাস জানিতেন। সেলাম করিয়া কেচ্ছা আরম্ভ করিলেন।

কিসে হয়, তাহা স্থির করুন, নতুবা ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। বক্তার কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেরই চক্ষু উন্মীলিত হইল, সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্থির করিল,—অদ্য হইতে, "নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা জীবন উপায় নির্ব্বাহ করিবে", যে উপায়ে, যে ভাবে হউক, আর এইরূপ ভাবে পরের উপর নির্ভর করিবে না। নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইবে, নিজের অভাব নিজে পূরণ করিয়া লইবে। আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না। স্বধু কথায় নয়, বস্তুতঃ কাজেও অনেকে প্রবৃত্ত হইল,—কেহ তাঁত লইয়া বসিল, কেহ কারখানায় গেল, এবং কেহ শিল্পাগার উদ্ঘাটন করিল। দেশময় তুমল একটা অভিনব পরিবর্ত্তনের যুগ আরম্ভ হইল। এমত শুভযোগে,—কেলুয়া ভুলুয়া ইত্যাদি নামে কতকগুলি কুল-কলঙ্ক বাহিরে, ভিতরে ঘোর কালিমার বোঝা লইয়া,—স্বজাতি ভুলিয়া, সমাজ ভুলিয়া—ঈর্ষাবশতঃ গাত্র দাহে নিজ নিজ প্রাধান্য বলবৎ রাখার আশায়, অপর সাধারণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, নানারূপ বিরুদ্ধবাদে এবং অবৈধ কার্য্যে, জনসঙ্ঘ বিচলিত করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু—"উদ্দেশ্য যাঁহার সৎ ভগবান তাঁহার সহায়," কুলাঙ্গারগণ—শিকার করিতে এক দিন বনে বাহির হইয়াছিল, কেহ সর্পদংশনে প্রাণ হারায়, কেহ বা বাঘের মুখে হত হইয়াছিল। রাত্রি অধিক হইয়াছে—এই স্থানে কেচ্ছা শেষ করিয়া ফরাজী মিঞাকে তাহার বিশ্রাম স্থানে যাইতে অনুমতি করিলাম।

"You'll find the friendship of the world a show!
Mere outward show! 'tis like the harlot's tears

The statesman's promise, or false patriot's zeal,
Full of fair seeming, but delusion all."

(*Sir T. Overbury*)

বাল্য জীবন বড় মধুর সময়! ধৃতি তখন সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। বাহুতে বল, হৃদয়ে প্রফুল্লতা এবং মনোবৃত্তি তখন স্ফূর্ত্তিতে পূরিত। বাস্তবিকই তখন ধরা—শরা বলিয়া মনে হয়। এই বালক কালের সাধনাই, সুখ-দুঃখ এবং ভবিষ্য জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংসর্গ ইত্যাদি বিশেষ সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ যেরূপ সংসর্গে থাকিয়া শৈশবে চরিত্র গঠন করা হয়, কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ণ জীবনে, তাহার স্পষ্ট রেখা প্রতিফলিত হয়, সে রেখা সমূলে উঠাইয়া ফেলা মানুষের একরূপ সাধ্যাতীত। লোক-চরিত্র বিচার করিতে হইলে, বাল্য-জীবনের সমালোচনা একান্ত বিধেয়।

কৈশোর হৃদয়-উদ্যানের প্রস্ফুটিত স্মৃতি-কুসুম বড়ই মনোহর, বড়ই চিত্তানন্দপ্রদ। যখনই শৈশবের স্মৃতির দিকে ফিরিয়া চাওয়া যায়,—হৃদয়ের শত দুঃখ-যন্ত্রণা ক্ষণকালের তরে প্রশমিত করিয়া আনন্দের উৎফুল্ল সাগরে যেন হৃদয় ডুবাইয়া ফেলে। কোন কবি বলিয়াছেন,—

"শৈশবের বিনোদবীণায়
বাজিত যে মধুর সঙ্গীত,
আজো যেন, দূরশ্রুত মৃদুধ্বনি প্রায়,
মাঝে মাঝে হতেছে ধ্বনিত।"

আহা! শৈশব-স্মৃতি কি মধুর,—কত সুখের! সে

কুসুমের একটী ছিন্ন দল, দেব-নির্ম্মাল্য হইতেও যেন অধিকতর পবিত্র এবং প্রীতিপ্রফুল্ল বলিয়া মনে হয়। যাঁহার অনুর্ব্বর হৃদয়ে, সংসারের তাপে ঐ শৈশবের স্মৃতি-কুসুমগুলি শুকাইয়া গিয়াছে সে বড়ই নীরস, বড়ই কঠোর, এবং বড়ই অন্তঃশূন্য অবস্থায় বিদ্যমান। সে বহুদিনের কথা, কিন্তু আজও প্রত্যেকটী বিষয়, প্রত্যেক ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে আমার স্মৃতিতে সুদীপ্ত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আমাদের শিকারের কোন বাধা-বিঘ্ন ছিল না; তৎকালে বন্দুকের আইন প্রচার হয় নাই, বন্দুকের পাস্ প্রয়োজন ছিল না, কেহ প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল না; শিকারও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত! তাম্বুতে গেলে কি আনন্দ, কত যে স্ফূর্ত্তি বোধ হইত, তাহা এখন আর বলিয়া বুঝান যায় না। সময়-স্রোতে কত যে সুখের তরঙ্গ সম্মুখ দিয়া তরতর-ভাবে চলিয়া যাইত, গণিতে গেলে ঠিক আকাশের তারকা সংখ্যা। আমরা সেই সময়-স্রোতের সুশীতল তীরে, কখন আম গাছের নীচে, কখন কাঁটাল গাছের তলে, কখনও বা বট, অশত্থ, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া, কত যে মধুর গল্প করিয়াছি, কত বাদ্সাকে যে কত দিন সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফকির সাজাইয়া অরণ্যে পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। সূর্য্যদেব, বোধ করি আমাদের এই সমস্ত তামাসা দেখিবার মানসেই, প্রথম পূর্ব্বাকাশে, উঁকি ঝুঁকি মারিয়া অধীর প্রাণে, সমস্তটা দিন আমাদের সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষ পরিশ্রান্ত হইয়া গাছের মাথার উপর দিয়া গুপ্ত দৃষ্টি করিতে করিতে গড়াইয়া পড়িয়া একবারে অস্তাচলের গুহায় ঘুমাইয়া

পড়িতেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁর সাধ মিটিত না। আমাদের আচার, ব্যবহার ও গতির পর্য্যালোচানর জন্য, শ্রীযুত শশাঙ্ক দেব বাহাদুরকে প্রহরীর কার্য্যে নিয়োগ করিয়া যাইতেন। "যথাপূর্ব্ব তথাপর।" আহা! এখনও যেন ঐ সকল ঘটনা চক্ষের উপর ভাসিতেছে। যাহা গিয়াছে চির জীবনের তরে গিয়াছে, কিন্তু হুবহু ছবি এখনও মানস দেয়ালে বিলম্বিত। গাছে গাছে পাখীর কিচি-মিচি রব, পাপিয়া, দৈয়েল, শ্যামা প্রভৃতি সুকণ্ঠ বিহগকুলের বায়ু তরঙ্গে সাঁতার, বিশুষ্ক পুরাতন পত্রের ঝুর-ঝুর পতন শব্দ, নব পল্লবের উদ্গম, নীরবে গাছের ছায়ায় বসিয়া এই সকল দৃশ্য অবলোকন করিয়া কত আনন্দানুভব করিয়াছি। আর কি জীবনে সে সুখ উপভোগ করিব ?

খুব ভোরের বেলায় আমরা শিকারে বাহির হইলাম, পুষ্প পরিশোভিত শিমূল বৃক্ষ, এবং অন্যান্য পত্র-বিহীন বৃক্ষ-পুঞ্জ অতিক্রম করিয়া আমরা জঙ্গলের পানে যাইতেছি; এমত সময় ফরাজী সাহেবের হাতী আমাদের নিকট আসিল; এবং ফরাজি তাহার নিজ শিকারের এক অদ্ভুত কাহিনী বলিতে লাগিল। ঐ শ্রেণীর শিকারীদিগকে "মাটিয়া পালোয়ান" বলে, তাহারা মুঙ্গেরী তোড়েদার অথবা কেপ্‌দার বন্দুকই সাধারণত ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের বন্দুক ভরিবার প্রথা "চারিতালা।" অর্থাৎ প্রথম দেশী বারুদ, তৎপরে কিছু কাগজের পুরিয়া দিয়া তাহার উপর একটী গুলি;—(সে গুলিও গৃহজাত, হাতে প্রস্তুত, অর্থাৎ দা অথবা অন্য কোন ধারাল লৌহ দ্বারা সীসা কাটিয়া কোনরূপে

কতকটা গোল করিয়া লইয়া কাগজের উপর দিয়া তৎপর ঐরূপ আর একটী গুলিকে "যাঁতি" দ্বারায় চারি খণ্ড করিয়া পুনরায় উহাকে একত্র করিয়া সুগোল করা হয়) ঐ গুলির উপর স্থাপন করিয়া উহার উপর কাল্‌পি "slug" ভরা হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—আওয়াজে বন্দুক একটুকু ফাটিত না এবং বন্দুক ফাটিয়া কাহার যে কখন কোন বিপদ হইয়াছে তাহাও শুনা যায় নাই। ঐ সকল মুঙ্গেরী বন্দুক একনালী ছিল। ঐরূপ বন্দুক ভরার তাৎপর্য্য ফরাজী মিঞা বলিলেন, যে ঐ এক ভরাতে, উভয়বিধ শিকারের কাজ নির্ব্বাহ হয়, অর্থাৎ ছোট শিকার—যথা খাটুয়া হরিণ "barking deer" প্রভৃতি হইলে কাল্‌পিতে কাজ করিবে। বড় শিকার-সাম্বর "গাউজ" হইলে, সেই চারি খণ্ড করা গুলিতে,—আর বাঘ ভল্লূক হইলে ঐ যে হাতে তৈয়ার করা বড় সীসার গুলি তাহা দ্বারা কার্য্য হইবে। এক দিন, ফরাজী সাহেব একটী বড় গাউজের আশায় এক বৃহৎ গাছের উপরে প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু গাউজ না আসিয়া তৎপরিবর্ত্তে, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। চারি দিক আঘ্রাণ করিয়া ব্যাঘ্র বাহাদুর, ফরাজী মিঞা যে গাছের উপর, সেই গাছের তলায় বসিয়া আলস্য ভঙ্গ করিতে লাগিল। বাঘ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যায় না, ফরাজী মিঞাও গাছ হইতে নামিতে পারে না। ভয়ানক সমস্যা—"To be or not to be that is the question"

"হয়, কি না হয় প্রশ্ন ইহাই এখন,
মারিলে বাঁচিব, আর ছাড়িলে মরণ।"

অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিয়া, অবশেষ ফরাজী তাহার সেই পাঁচ হাত লম্বা মুঙ্গেরী বন্দুক তুলিয়া বাঘের প্রতি লক্ষ্য করিল। যেমন ঘোড়া টিপিলেন দ্রুম্ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাঘও ভীমগর্জ্জন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। পরক্ষণেই তিনি গাছ হইতে নামিয়া দেখিলেন, বাঘের শরীরে তাহার "চারি তালা" ভরা গুলিসমূহ ভেদ করিয়াছে, অর্থাৎ গুলি, কাল্‌পি প্রভৃতি বন্দুকের গর্ভে যাহা কিছু বোঝাই করা হইয়াছিল সে সমস্তই বাঘের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে; তাই, আর ব্যাঘ্রটী বড় নড়ন চড়নে ক্ষমতা জাহির করিবার অবসর পায় নাই। শিকার দেখিয়া ফরাজী খুবই সুখী হইলেন বটে, কিন্তু তাহার ভাবনা হইল কিরূপে ঐ বৃহৎ বাঘ জঙ্গলের বাহির করে ও বাড়ীতে লইয়া আসে; একা, সঙ্গে এক বন্দুক ছাড়া আর কিছুই নাই। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র" তিনি যখন ঐরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন গড় হইতে কতিপয় কাঠুরিয়া, বন্দুকের ধ্বনি শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের সাহায্যে ফরাজী সাহেব বাঘ লইয়া গৃহে ফিরিলেন। পাঠক! শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, ফরাজী মিঞা বলিয়াছেন, তিনি গ্রামে গ্রামে বাঘ দেখাইয়া সরকার বাহাদুরের পুরস্কার সমেত শতাধিক টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতক্ষণ অবাক হইয়া ফরাজীর গল্প শুনিলাম, আর বন্দুকের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম। বন্দুক অপেক্ষা অধিক তারিফ করিলাম তাহার বক্ষঃস্থলের এবং বাহুমূলের সুদৃঢ়তার।

গল্প করিতে করিতে আমরা বৈতরণী নদী উপম ছিট্ গড়ের সম্মুখীন হইলাম। মাহুতগণ "আল্লা আল্লা" ধ্বনি

করিয়া কণ্টকাকীর্ণ সূচীদুর্ভেদ্য ছিট্‌গড়ের মধ্যে হাতী প্রবেশ করাইল। গাঢ় ঘন অটবী; চতুর্দ্দিকে স্তূপে স্তূপে অন্ধকার; কাঁটা, ডাল পালার ও লতার ভয়ে আমরা সশঙ্কিত চিত্তে হস্তী পৃষ্ঠে বসিয়া আছি। হাতী কোথায় যাইতেছে, কোন দিকে টানিয়া নিতেছে; কিছুই দৃষ্টি পথে পতিত হইতেছে না, অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার! কেবল মাঝে মাঝে মাহুতগণের মার-মার, ধর-ধর, বড়ি-বড়ি, শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হাতীর জঙ্গল ভাঙ্গার "মড়-মড়, কড়-কড়," বিকট শব্দ শুনা যাইতেছে। আর ক্বচিৎ কোথাও দু একটী ঘুঘু পাখী শব্দাতঙ্কে শঙ্কিত হইয়া, সভয়ে সর্‌-সর্‌ করিয়া কুলায় হইতে উড়িয়া পলাইতেছে, এই অনুভব হইতে লাগিল। এই অটবীকেই বৈতরণী বলিয়াছি। এই বৈতরণী পার হইতে না পারিলে আর সেই স্বর্গস্থান,—শিকার ভূমিতে উপস্থিত হইবার দ্বিতীয় পথ নাই। অনেক হুড়া-হুড়ী, অনেক ধস্তা-ধস্তীর পর, বিক্ষত না হইলেও, ক্ষত দেহে ছিটগড়ের বাহির হইলাম। "দুর্গা" বলিয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। হাতীগুলি গুরুতর শ্রমের পর ফস্‌ ফস্‌ করিয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল। মাহুতগণ "আল্লা-রসুল" বলিয়া বিরাম লাভ করিল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় হাতী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল। গায়ের কোট, হাতীর গদী ভালরূপে ঝাড়িয়া পুছিয়া আমরা দৃঢ়রূপে প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। ফরাজী মিঞার হাতী, আমার হাতীর নিকটে আসিল, এবং আমাকে আরও একটু অগ্রসর হইতে বলিল। কিছু সম্মুখে যাইয়াই দেখিতে পাইলাম, নব পল্লবিত শাল-

গাছের একটী ঝোপের মধ্যে শৃঙ্গধারী তরুণ বয়স্ক একটী সুন্দর গাউজ দাঁড়াইয়া আছে। আমি স্পষ্ট উহার সর্ব্ব শরীর দেখিতে পাইলাম, বাবুর হাতীও পাশে ছিল। জানি না, আমি কেন নিজে গুলি না করিয়া বাবুকে হরিণটী, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, দেখাইয়া দিলাম। বাবু অমনি বন্দুক উঠাইয়া "ধা" করিয়া উহার উপর গুলি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ধীরতা সহ লক্ষ্য না করায় (Excited হওয়ায়) উপযুক্ত স্থানে গুলি বিদ্ধ না হইয়া, উহার পিছনের এক পায়ে গুলি লাগিয়া গাউজটী খোঁড়া হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। বাবু উহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। আমরা আর অগ্রসর হইলাম না, অল্পক্ষণ পরেই কিয়দ্দূরে বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল এবং অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, গাউজ পড়িয়াছে, হরিণ সম্মুখে করিয়া বন্ধুবর দণ্ডায়মান। গাউজটী হাতীতে উঠাইয়া বাবুকে ধন্যবাদ এবং উৎসাহ দিতে দিতে আমরা পুনরায় শিকারের উদ্দেশে বাহির হইলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, অনতিদূরে একটী বিলের মত স্থান দৃষ্টিপথে পতিত হইল। খুজী মিঞাকে জিজ্ঞাসা করায় সেও উহাকে একটী বিল বলিয়াই নির্ণয় করিল, অধিকন্তু বলিল, ঐ স্থানে প্রচুর পরিমাণে বন্য মহিষ থাকে, এখানে গেলে পাওয়া যাওয়ার সম্ভব। মহিষের কথা শুনিয়া অন্যান্য হাতী পশ্চাৎ রাখিয়া ধীরে ধীরে আমরা বিলের দিকে অগ্রসর হইতেছি, এবং কতকটা নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র দেখিতে পাইলাম, অন্যূন ৫০ কি ৬০টী মহিষ জল হইতে উঠিয়া আমাদের দিকে একবার চাহিয়া, এক লাইনে (একটীর পাছে, অন্যটী)

জঙ্গলাভিমুখে চলিল। কর্দ্দমাক্ত মহিষপাল দেখিয়া বোধ হইল যেন একখানা চলন্ত মাটির দেয়াল আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছে। এই তামাসা দেখিতেছি, ইতিমধ্যে মহিষপাল বন্দুকের "পাল্লা" ছাড়াইয়া অনেকটা দূরে যাইয়া পড়িল, সুতরাং আর উহাদের উপর আওয়াজ করা হইল না। এযাত্রা মহিষের তামাসা দেখিয়াই তৃপ্ত হইলাম, আবার লাইন করিয়া হরিণের উদ্দেশে চলিলাম। পথে শিকারীগণ দু'টী হরিণ শিকার করিল, বাবুও আর একটী জাত-হরিণ মারিলেন। আজ তাঁহার বিলক্ষণ সুযাত্রা। দু'-দুটা শিকার, বড়ই স্পর্দ্ধার বিষয় সন্দেহ নাই। বাবু খুব স্ফূর্ত্তিতে আলাপ যুড়িয়া দিলেন। আমি তাঁহার ন্যায় ঈর্ষাপরবশ না হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট বাহাদুরী দিতে ক্রুটি করিলাম না। আমরা যাইতেছি, পথিমধ্যে একটী ঝোপের আড়ালে ছোট খাটুয়া হরিণ আমার "শিকারী ছোক্‌রার" নজরে পড়িল, সে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে ঐ হরিণটী দেখাইল। আমি ছর্‌রা (Buck-Shot) নিক্ষেপ করিলাম, হরিণটী তাহাতে না পড়িয়া, খোঁড়া হইয়া যাইতে লাগিল। তখন বেলা অধিক হইয়াছে, প্রখর সূর্য্যের তাপ! টিফিনের নিমিত্ত আমরা ছায়ার অনুসন্ধান করিতেছি, দূরে এক প্রকাণ্ড বটগাছ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ স্থানেই বিশ্রাম করা হইবে, বটগাছের নিকটে একটী পুরাতন পুষ্করিণী আছে এমত খুজী সাহেব বলিলেন। আমরা ঐ বটগাছ লক্ষ্য করিয়াই হাতী প্রধাবিত করিলাম। আমরা যখন উক্ত বটগাছের সম্মুখীন হইয়াছি, তখন দেখিতে পাইলাম, আমার আহত হরিণের ন্যায় একটী ছোট হরিণ

ঘাসবনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া খোঁড়াইয়া পলাইতেছে। আমাদিগকে ঐখানেই নামিতে হইবে, সুতরাং আমি ত্বরা হাতী হইতে নামিয়া 'জলদ্ কদমে' হরিণের পাছে ছুটিলাম। ভরসা, উহাকে সহজেই শিকার করিয়া আনিতে পারিব। কিন্তু যখন উহার অনুসরণ করিলাম, তখন আর হরিণ দেখিতে পাই না। সম্মুখে কাঁটা শালগাছের একটা প্রকাণ্ড "টাল" দেখিতে পাইয়া ভাবিলাম, উহার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে কোথায় হরিণটী আছে, তাহা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারিব। উহার উপরে উঠিলাম,—

"সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

শীতের পর বসন্ত, সুখের পর দুঃখ ইহাই প্রকৃতির বিধান! কবি বলিয়াছেন,—

"সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ,
কালচক্রে ঘোরে পদে পদে,
তাহার মাঝেতে নর, করে বাস নিরন্তর,
শৃঙ্খলেতে যথা চতুষ্পদ।"

বিপদ মানুষের পদে পদে! বিপদ-আপদের সমষ্টি লইয়াই মানব জীবন! ঘড়ির কাঁটার মত প্রতিনিয়তই বিপদ মানুষের মাথার উপর দিয়া ঘুরিতেছে। কখন কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না, কি বুঝিতেও পারে না, কারণ, তখন বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে, তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"হেম্নঃ কুরঙ্গো নৈব দৃষ্ট পূর্ব্বঃ,
তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য।



শালস্তূপের নিকট ভল্লুক—১৬৩ পৃঃ

বিহায় সীতাং মৃগমন্বধাবৎ,
বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধিঃ।"

মানুষের উপর যখন শনির দৃষ্টি পড়ে, বস্তুতই দেখা যায় তখন স্বীয় প্রকৃতির বিপরীত আচরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। অমন যে শান্ত-শিষ্ট পরমজ্ঞানী, বুদ্ধিমান রাজা শ্রীরামচন্দ্র, তিনি স্বর্ণ মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন কেন? বীরাগ্রগণ্য রাজনীতিজ্ঞ রাজা দশানন, সতী সাধ্বী সীতা দেবীকে হরণ করিয়া, পরিণামে স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস করিবেন কেন? কবি ইহাকেই বলেছেন,—"বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি।"

আমি যেমন ঐ শালগাছের টালের উপর উঠিলাম, ও সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনি আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আত্মা কাঁপিয়া উঠিল, দেখিলাম কি না, এক প্রকাণ্ড ভল্লুক ঐ স্তূপের আড়ালে ছায়াতে শায়িত, আমাতে উহাতে ব্যবধান অনুমান ৮ কি ১০ হাতের অধিক হইবে না। যেমনি আমি টালের উপর উঠিয়াছি, অমনি আমার প্রতি তাহার নজর পড়িল, যেমনি নজর, অমনি বিকট গর্জ্জন করিয়া ঐ জঙ্গল-ভূমিকে কম্পিত করিল এবং লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইল। নিরূপায়! তখন যদি পলাইতে চেষ্টা করি, নিশ্চয় আক্রমণ করিবে, সে আক্রমণ নিবারণের উপায় আমা দ্বারা সম্ভবে না। স্তূপ হইতে নামিলে ভল্লুকের হাতে মৃত্যু নিশ্চয়। ভল্লুক দুই পায়ে ভর করিয়া, ঠিক মানুষ যেমন দাঁড়ায়, তদ্রূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি অনুপায় হইয়া খুব জোরে

"চুপরাও" বলিয়া তাহার চীৎকারের প্রতিজবাব দিলাম। টিফিনের স্থান, এখান হইতে বড় বেশী দূর নহে, উদ্দেশ্য, ভালুকের গর্জ্জন এবং আমার চীৎকার শুনিয়া বন্ধুবর অন্যান্য লোকসহ নিশ্চয়ই সাহায্য করিতে আসিবেন। কিন্তু হায়! এই দুঃসময়ে কেহই আসিল না, কেহই আমার এই বিপদের সাথী হইতে অগ্রসর হইল না।

এই সংসারে, সুসময়ে বহু বন্ধু, বহু আত্মীয় স্বজন দেখা যায়; কিন্তু দুঃসময়ে, বিপদের মুখে, কেহ কার নয়, তখন তাহারা কৃতী, আর বিপন্ন অকৃতী। বিপন্ন নির্ব্বোধ, তাহারা মহাজ্ঞানী। বিপন্নের ছায়া মাড়াইতে তাঁহারা কলঙ্ক মনে করেন। হায়! এই স্বার্থ মাখা, কুটীল জগতে, একের জন্য কি অন্যের অশ্রু পতিত হওয়া মহা পাপ! এই নৈরাশ্যের ভাঙ্গা বাজারে, একটী মাত্রও সান্ত্বনার পসরা লইয়া কেহই কি বেচা কেনা করিতে অভ্যস্ত নয়? মুদিত কুসুম, কেবল কীট কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইবে, প্রস্ফুটিত না হইলে ভ্রমর কি কখনও তাহার প্রতি ধাবিত হয় না! আমি সঙ্কটাপন্ন! ভালুকের মুখে প্রাণ "হারাই হারাই!" কৈ, কেহত আমার তত্ত্ব করিল না, কেহইত আমার বিপদে বক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইতে অগ্রসর হইল না? এ জগতে কি সহানুভূতি নাই,—সব স্বার্থে জড়িত ;—

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবণী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

কবির এই প্রবচন কি তবে কল্পনার বিকার ?—

কি ভাবিয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলাম। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। মহাশূন্য, ঘোর নৈরাশ্য!—অনন্ত প্রলয়! ভল্লুক আর দুই পা অগ্রসর হইলেই, আমার সহিত ধরাধরী হয়। যাঁর উদ্দীপনা তিনি জানেন,—মহাপাপী অধম জীব আমি, অচিন্তিত ভাবে একান্ত অজ্ঞাতে, কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বিপদে মধুসূদন!" ঊর্দ্ধ-নেত্রে, ঘর্ম্মাক্ত ললাটে ভাবিলাম, হায়! আমি কি বন পুষ্পের মত বনে ফুটিয়া অকালে, অসময়ে এই বন ভূমিতেই ঝরিয়া পড়িব, ভগবান! কেহইত দেখিল না, আমিও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। প্রভো হৃদয়ে বল দেও—সাহস দেও।

ভল্লুক ক্রমে আরও অগ্রসর হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ কর্কশ গর্জ্জনে বনস্থলী প্রকম্পিত করিল। আমি পুনরায় "চুপ্‌রাও" বলিয়া ধমক দিলাম, মাত্র দুই তিন পা পশ্চাতে হটিল। স্থির করিলাম ভল্লুক আমার সঙ্গে খেলা করিতে আসে নাই, আমি তাহার খেলার দোসর নহি; সে দুর্দ্দান্ত, আমি শান্ত, সে আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইবে না।

"Fate made me what I am, may make me nothing,
But either that or nothing must I be ;
I will not live degraded."

বন্দুক লইয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইলাম, পকেট হইতে দুইটী গুলির কার্ত্তুশ বাহির করিয়া বন্দুকে পূরিলাম, এবং সতর্কতার সহিত ভল্লুকের গতিবিধির উপর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এখানে বলা প্রয়োজন, বাঘ-ভল্লুক কর্ত্তৃক কেহ আক্রান্ত হইলে, চক্ষের উপর তাহার স্থির লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য; প্রবাদ আছে, "বাঘ ভালুকের চারি চক্ষে লজ্জা" এ কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, ঠিক।

ভল্লুক এইবারে সতেজে আমাকে যেমনি আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, তাহার বুকের সাদা স্থান লক্ষ্য করিয়া, অমনি আমি গুলি করিলাম,—এক গুলিতেই ভালুক পলট খাইয়া ধরাশায়ী হইল। আমি ভগবানের মহিমাকে ধন্যবাদ দিয়া লম্বা কদমে টিফিনের স্থানে উপস্থিত হইলাম। আর আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বাবুর নিকট বিবৃত করিয়া তাঁহাদের ভীরুতায় ধিক্কার দিতেও ত্রুটী করিলাম না। কিন্তু সকলেই আমার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং ভল্লুকের চীৎকার শুনার বিষয় একস্বরে অস্বীকার করিলেন। আমিও তাহাদের কথা স্বীকার করিয়া লইলাম। ভল্লুক আনিতে হাতী পাঠাইয়া টিফিনে বসিলাম। বেলা প্রায় অবসান, শিকারও যথেষ্ট হইয়াছে, তাঁবুতে ফিরাই স্থির করা হইল।

পর দিন আমাদের বিশ্রামের দিন, শিকারে বাহির হইব না। কিন্তু "গুপ্ত বৃন্দাবন" দেখিতে যাইব সে কল্পনা স্থির। মধুপুরের গড়ের অন্তর্গত রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের অনতিদূরে, এক মনোরম বনমধ্যে "গুপ্তবৃন্দাবন" অবস্থিত। ইহার নাম "গুপ্তবৃন্দাবন" কেন হইল, এবং মধুপুর গড়েই বা

ইহা অবস্থিত কেন? বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও আমরা তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে স্থানটী যেরূপ মনোরম, এবং শান্তিপ্রদ, তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, সেই উশৃঙ্খল মুসলমান শাসন সময়ে, মোহন্ত বাবাজীউ উপজীবিকার উপায় উদ্ঘাটন মানসে, ঐ নির্জ্জনস্থানে রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক "গুপ্তবৃন্দাবন" নাম দিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন মাত্র। স্থূল কথা উহা তৎকালীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা "গুপ্তবৃন্দাবন" দর্শন মানসে হাতীতে চড়িয়া শিবির হইতে বহির্গত হইলাম। সঙ্গে দুইটী ছর্‌রার বন্দুকও লইলাম। ধীরে ধীরে যাইতেছি, পথে স্বভাবসরল কৃষক বালক নিচয় হা করিয়া পরস্পর "মুখ চাওয়া চাহি" করিতেছে এবং হাতীর গতিবিধি ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে নৃত্য করিতেছে। অনতিদূর হইতে কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির রাখাল বালক হাতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিল,—এবং দশ-বারটী বালক সমকণ্ঠে সুর করিয়া তাহাদের অভ্যস্ত গ্রাম্য "ছড়া" গাইতে আরম্ভ করিল।—

"আত্তিরে আত্তি,
আমরা পিছে আছি,
তোর পায়ের নীচে বরৈর বিচী।"

অন্য দিক হইতে আর এক দল বালক গাইতে লাগিল;—

"আত্তিরে আত্তি
অরে আমার আত্তি
না যাবিত অত্তি
তোর কপালে লাত্তি।"

কোথাও কৃষকপত্নী ঢেঁকিতে ধান ভানিতেছে, আর তাহার সম্মুখে গোহাল ঘরের পার্শ্বে একটী কাঁঠাল গাছের নীচে বসিয়া একজন কৃষক স্বয়ং বাঁশের শলা প্রস্তুত করিতেছে। তাহার ঘাড়ে, পৃষ্ঠে, কাঁধের উপর পুত্র কন্যাগণ ঝুলিয়া পড়িয়া শৈশব কলায় প্রফুল্লিত,—দেখিলে বোধ হয় যেন ঠিক কাঁঠাল গাছে "ইঁচড়" ফলিয়া রহিয়াছে। হায় ভগবান, এ আবার তোমার কোন্ লীলা! কেহ প্রাণান্ত সাধনায় একটী পুত্র মুখ দর্শনের অধিকারী হইতে পারেন না। আবার কাহারও বা ঘরে সন্তান-সন্ততির স্থান সঙ্কুলন হয় না।

যাইতে যাইতে আমরা একটী বিলের পাশে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বিলটী পরিষ্কার স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ। নীলাকাশের ছায়া প্রতিফলিত হইয়া বিলের জল নীলিমাময়। বর্ষার জল কমিয়া গিয়াছে, কানাচে কানাচে, নানারূপ জলজ গুল্ম, এই অল্প দিন হয় মাত্র অঙ্কুর মেলিয়া স্তরে স্তরে কোথাও গাঢ়, কোথাও বা অনতিগাঢ় ভাবে, প্রকৃতি দেবীর অবগাহন জন্য যেন সোপান শ্রেণী রচনা করিয়া বিলের সলিল প্রান্ত স্পর্শ করিতে সমুৎসুক। বিলের মধ্যে স্থানে স্থানে জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত; কুমুদ কুল সংখ্যায় বড় বেশী নয়। সুখের শরতের সঙ্গে-সঙ্গেই অধিকাংশ পদ্মফুল অতি ম্রিয়মাণ ভাবে, পত্রপরাগবিহীন অবস্থায়,

নির্ব্বাপিত শ্মশানের অর্দ্ধদগ্ধ বংশদণ্ডের ন্যায় পূর্ব্ব স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুখময় বসন্তে কেবল স্থলজ কুসুমেরই সৌষ্ঠব। হায়, প্রকৃতির কি জটিল সমস্যা! এই সুখের বসন্তে জল কুসুম ম্রিয়মাণ! ইহাতেই মনে হয়, সুখ দুঃখ, উত্থান, পতন কেবল নর সমাজের জন্যই নিয়ন্ত্রিত নহে। প্রকৃতির খেলা—সুখের পার্শ্বে দুঃখ, হর্ষের পর বিষাদ। তবে, মানুষ আমরা, আমাদের এই বৃথা হাহাকার কেন? বাবু একটী পদ্মফুল আনিতে বলিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে হাতীর একটী মেট বালক বহু কষ্টে একটী পদ্মফুল আনিয়া বাবুর হাতে দিল। বাবু অতি স্মিতমুখে ফুলটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শুঁকিতে লাগিলেন। পদ্মের দলগুলি নর-করস্পর্শে হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, একটু শিথিল হইয়া যাওয়ায় ভোঁ শব্দ করিয়া একটী সুরসিক ভ্রমর আমাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া উড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে বাবু অবাক্ হইয়া আমাকে বলিলেন "দেখ্‌লেন বেটা ভ্রমরের কাণ্ড খানা?"—কাব্যে এইরূপ ঘটনা পূর্ব্বে শুনিয়াই ছিলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মীমাংসা হইল। আমি বাস্তবিক একটু বিস্মিত হইলাম। বুঝিলাম নিমজ্জিত না হইলে, সংসারে প্রেম পাওয়া যায় না। সংসারী মানুষ আমরা, আমাদের প্রেম, প্রীতি কি ভালবাসা মাত্র একটা স্বপ্নের আবছায়া। কিন্তু যথার্থ প্রেম এই ভ্রমরের। এই প্রকৃত প্রেমপাগল; জীবনের মমতা নাই, অন্য বাসনা নাই, গন্ধে মাতোয়ারা, মধুস্বাদে আত্মহারা। জীবন-মরণ উহার প্রেমের ভিতরই নিমজ্জিত।

যাইতেছি, বিলের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছি, ইতিমধ্যে অনতিদূরে হংসধ্বনি শুনিয়া মাহুতগণ "আঁস্ আঁস্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ঐ দিকে হাতী চালাইল। এইরূপ হংসশ্রেণী দেখিতে বড়ই সুন্দর! নীল জলে যেন সাদা পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, কেহ আচঞ্চু গ্রীবা জলে ডুবাইয়া খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত, কেহ ডানায় ভর করিয়া কাঁৎ কাঁৎ শব্দে জল পরিধির উপর পড়িয়া, অপর দুই চারিটার সঙ্গে জলকেলিচ্ছলে পরস্পর যুগপৎ ডুব দিয়া, "হুস" করিয়া অন্য স্থান হইতে ভাসিয়া উঠিতেছে, কোনটী বা একটু ক্ষুদ্র আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক শুভ্রশির ডানায় গুটাইয়া, মাত্র এক পায়ে ভর করিয়া একপার্শে চুপ্‌টী করিয়া বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে। দেখিয়া মাহুতগণ "মারেন মারেন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু গুলি করিতে ইচ্ছা হইল না। বন্ধুবরের আগ্রহাতিশয্যে যে সমস্ত হাঁস সন্তরণ ও ডুবা-ডুবী করিয়া খেলা করিতেছিল অনিচ্ছায় তাহার কয়েকটী মারিলাম। বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া পাখীগুলি উড়িতে আরম্ভ করিল। বাবু চেষ্টা করিয়া ঐ উড্ডীন পাখী দুচারিটা মারিলেন। হাঁস কয়টী আহরণ করিয়া আমরা সেই গুপ্ত বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

গুপ্ত বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর, অতীব মনোরম। শ্যামল পল্লব-পরিশোভিত তরুরাজির পর তরুরাজি, ব্রততী-বল্লরী সমাবৃত কুঞ্জবন; মাঝে মাঝে নানাবিধ রঙের বনজ পুষ্প, ভ্রমরের ঝঙ্কার, কোকিলের কাকলীতে, শ্যামার সুমধুর কণ্ঠে ঐ নির্জ্জন বনভূমি মুখরিত। থাকিয়া থাকিয়া

তাহার মাঝে আবার পাপীয়া বোধ হয় কাল মহত্ত্বে অন্য বুলি ছাড়িয়া মনোদুখে—"চোখ গেল" "চোখ গেল" বলিয়া বিরহসন্তপ্ত হৃদয়ে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ময়ূর-ময়ূরী পাপীয়ার ব্যথায় যেন কাতর হইয়া কেকারবে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কোথাও বা দুই একটী মৃগশিশু ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এই বনের পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি প্রাণিসমূহ যেন ভীতির রাজ্যের কোন খবরই রাখে না; উহারা নির্ভীক, সদানন্দময়। এই নির্জ্জন, রমণীয় স্থানে "রাধা-কৃষ্ণ" গুপ্ত প্রেম-বিহার করিয়া প্রেম বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রমাণ— যে দিকে নেত্রপাত কর, যাবতীয় বস্তু প্রেমে পূর্ণ দেখিবে। "গুপ্ত বৃন্দাবনের" জীব, জন্তু, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি অদ্যাপি অত্যদ্ভুত প্রেম লীলার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া যাত্রি-গণকে প্রেম মাহাত্ম্য শিক্ষা দিতেছে। আমাদের হাতে বন্দুক দেখিয়া, গুপ্ত বৃন্দাবনের মোহন্ত বাবাজীউ আমাদের দ্বারা যেন উক্ত বনের কোন জীব-জন্তু হত্যা না হয়, তাহা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিলেন। আমরা তাঁহাকে অভয় দিয়া বেশ ভাল রূপে স্থানটী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগি-লাম। গুপ্ত বৃন্দাবনে "তামাল" নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। প্রকৃতি কর্ত্তৃকই উহার ডালপালা এমত সুবিন্যস্ত এবং ঘনীভূত, বোধ হয় যেন স্তম্ভ সারির উপর নীলবর্ণ চন্দ্রাতপ বিস্তৃত আছে। ঐ বৃক্ষগাত্রে ঠিক গোক্ষুরের ন্যায় একরূপ চিহ্ন আছে, উহা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের নিদর্শন বলিয়াই বাবাজী আমাদিগকে

প্রবোধ দিলেন। কিন্তু আমরা দেখিলাম, ঐ জাতীয় গাছের ঐরূপ চিহ্নই বিশেষত্ব। প্রখর সূর্য্যতাপে, বৃক্ষগুলি যেন অবসন্ন, বায়ু সঞ্চালনে তিরতির করিয়া পাতা দুলিতেছে। ঐ বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে স্থানে স্থানে টগর, রজনীগন্ধা, যুঁই, বেল প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পের সমাবেশ; যাহারা ফুটিয়া আছে, তাহারা যেন স্থান মহত্ত্বে বিহ্বল হইয়া হাসিতেছে,—আর যে গুলি বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়া জড়াজীর্ণ, সে গুলি পবন কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া "ঝুর ঝুর" করিয়া ভূমে পতিতান্তর বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইতেছে। আর একটী স্থানে যাইয়া দেখি, তামাল গাছের নিম্নে একটি লতাকুঞ্জ, মোহন্ত বলিলেন, এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক স্থানটি মান ভঞ্জনেরই যোগ্য নির্জ্জন—অধিকন্তু এই তামাল গাছের শিকড়গুলি এমত ভাবে বর্দ্ধিত, দেখিলে গহ্বরের ন্যায় বোধ হয়। তাহাও কৌতুক লীলার যোগ্যই বটে। এ সকল গহ্বরে না কি শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদিগকে লইয়া লুকাচুরি ও নানারূপ আমোদ আহ্লাদ করিতেন। স্থানটী দেখিয়া "দেহি পদপল্লব মুদারম্" মনে হইল। এই বনের আরও আশ্চর্য্য কাহিনী শুনা যায় যে, এই তামাল কুঞ্জের নীচে হরি-সংকীর্ত্তন করিলে বৃক্ষ হইতে মধুবৃষ্টি হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. যৎকালীন ময়মনসিংহে কালেক্টর ছিলেন, শুনিতে পাই তখন তিনি না কি ঐ বনে গিয়া হরি-সংকীর্ত্তনান্তর ঐ প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফলাফল তিনি বলিতে পারেন, তবে ঐরূপ বনে মধুবৃষ্টি হওয়াটা বড় অসম্ভব মনে করি না, কারণ বনের

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, এই লতা ব্রততী সমাবৃত ঘন বিপিনে নানাবিধ বন ফুলের মধুলোভে বিস্তর মধুমক্ষিকা পতিত হয়। সামান্য কারণে তাহাদের অশান্তি উপস্থিত হইলে, ঐ সমস্ত মধুলুব্ধ পতঙ্গ গুলি উড়িতে আরম্ভ করে। তৎসময়ে তাহাদের গাত্র বা পক্ষলিপ্ত মধুর বিন্দু ক্ষরণ অসম্ভব নয়। আমরা হরিসংকীর্ত্তন করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। যাহা হউক বিষয়টী আশ্চর্য্যজনক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মোহন্ত বাবাজী অন্য একস্থানে একটি নির্ঝরের নিকট এক পাষাণপ্রতিম স্থান নির্দ্দেশ করাইয়া বলিলেন—"এই অহল্যা পাষাণী;" প্রকৃত প্রস্তাবে জিনিসটা দেখিতে পাষাণেরই মত, কিন্তু তথাপি আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা বাজিয়া গেল। সন্দিগ্ধ মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিল না। বয়েসের চাঞ্চল্যে হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা উহার উপর আঘাত করাতে দেখিতে পাইলাম উহা আর কিছু নয়, প্রকাণ্ড এক গাছের শিকড়, হায়! পাষাণী অহল্যা এই পাপ কলিযুগে তুমি কি না গাছের শিকড় হইয়া এই নির্ঝর কুলে পড়িয়া আছ? বাবাজীর মুখের ভাবে স্পষ্ট বোধ হইল আমার এই পাষাণ উদ্ধার ব্যাপারে তিনি একটুকু রুষ্ট হইয়াছেন।

আমরা তন্ন তন্ন করিয়া গুপ্ত বৃন্দাবনের সমস্ত স্থান দেখিয়া শ্রান্তি দূর অভিলাষে, বাবাজীউর আখড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আখড়াটী খুব সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কতিপয় পর্ণকুটিরই আখড়ার সৌন্দর্য্যের উপাদান। এক খানাতে মোহন্ত থাকেন, আর একখানা লম্বা ঘর অতীথি অভ্যাগতের জন্য নির্দ্ধারিত আছে; আর একখানায় বহুতর

জ্বালানী কাষ্ঠ সংগৃহীত এবং অপর একখানা সজ্জিত গৃহে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখে ছোট একখানা ঘরে "বৃন্দাজীউ" অর্থাৎ তুলসী মঞ্চ স্থাপিত আছে। আঙ্গিনা খুব প্রসস্ত, এক পার্শে একটী কূপ, উহার জল বেশ পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং সুশীতল। বড়ই পিপাসা হইয়াছিল, ভৃত্যকে জল আনিবার আদেশ করাতে, মোহন্ত বাবাজী, তাহার স্বাভাবিক আতীথ্যপ্রিয়তাজনিত সৌজন্যে, এক গ্লাস জল, খান কত বাতাসা এবং একটু গুড় সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—হুজুর! আমি অতি দরিদ্র, জঙ্গলবাসী, আপনাদের সম্মুখে আহারীয় কিছু উপস্থিত করিতে পারি শক্তি নাই, তাহাতে এ জঙ্গলাস্থান, দ্রব্যাদি কিছু পাওয়া যায় না। প্রভুর প্রসাদ বলিয়া ইহা গ্রহণ করিলে আমি বড়ই সুখী ও কৃতার্থ হইব। প্রসাদ মাথায় স্পর্শ করাইয়া একখানা বাতাসা এবং একটুকু "গুড়" খাইয়া এক শ্বাসে এক গ্লাস জল পান পূর্ব্বক তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম।

মধুকৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—আর্থাৎ চৈত্র মাসে যে তিথীতে বারুণী স্নান হইয়া থাকে, সেই দিবস এই গুপ্ত বৃন্দাবনে, দিবসব্যাপী একটী প্রকাণ্ড মেলা প্রতিবর্ষেই বসিয়া থাকে। দেশদেশান্তর হইতে ঐ দিন সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। বহু দোকান, পসার বসে ও রঙ্গ তামাসা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই মেলা উপলক্ষে মোহন্ত বাবাজীর যে প্রচুর পরিমাণে আয় হয়, তদ্দারায়ই বৃন্দাবন রক্ষা, অতিথী সৎকার প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বিঘ্নে সঙ্কুলন হইয়া থাকে। এই মেলা "ছিটের মেলা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৃন্দাবন দেখিলাম,—রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দেখিলাম, মান ভঞ্জনের স্থান দেখিয়া আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিলাম, কিন্তু হায়! দেখিলাম না কেবল সেই সাধের কদম গাছ। এই মধুপুর বনে বহু পর্য্যটন করিয়াছি, বহুবার শিকার করিয়াছি কিন্তু কোথাও কখন একটী কদমগাছ নেত্র পথে পতিত হয় নাই। ইহা কি গাছের দোষ, না মাটির দোষ এ রহস্য উদ্ভিদজ্ঞ পাঠক উদ্‌ঘাটন করিবেন।

গুপ্ত বৃন্দাবন দর্শনান্তর তাম্বুতে আসিয়া, স্নানাহার শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা গেল। বেলা অবসান দেখিয়া আমি এবং বাবু একটী বহু পত্র বিস্তারিত গাছের নীচে যাইয়া উপবেশন করিলাম। বাবু তামাকু সেবনের ইচ্ছায় অতি উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যগণকে হাঁক ডাক আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চীৎকার শুনে কে? পূর্ব্ব দিনের হরিণের মাংস প্রভৃতিতে তাহারা ষোড়শোপচারে "ভোজনে চ জনার্দ্দন" অর্চ্চনান্তে তাহাদের গৃহ জাত কাঁথায় পড়িয়া নাসিকা রন্ধ্রে শার্দ্দূল নিনাদ বাহির করিয়া, এক এক জন ঢেঁকি অবতার হইয়া পড়িয়া আছেন, আর পার্শ্বের তাম্বুর লোকদিগের অশান্তির কারণ হইয়াছেন। বাবুর ডাক আর শুনে কে?

বাবুর চীৎকারে একজন বালক আসিয়া এক কলিকা তামাকু দিয়াগেল, বাবু আগ্রহের সহিত "সট্‌কা" ধরিয়া চুম্বন করিতে করিতে "বেড়স্থ" স্থান ধুমাইত করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। এবং নানারূপ ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গে হুকা এবং তামাকুর স্তব স্তুতি বিন্যাস করিয়া কৌতুক আরম্ভ করিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত, ধূলি উড়াইয়া গাভীগণ গৃহাভিমুখে

প্রধাবিত। সারাদিন খাটিয়া কৃষককুল লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া গৃহের পানে যাইতেছে, পথে কত আমোদ, কতই বা প্রসন্ন ভাব। একটী বালক পঞ্চমে সুর তুলিয়া গাহিল—

"ছাজিনা ফুল পাতাব
হাউরী তোর হনে।" *

আর একটী বালক অন্য দিক হইতে তেমনি সুরে গাইল—

"রাধে গো তুমি অধমেরে দেও গো শ্রীচরণ,
বাঞ্ছা কর গো পুরণ,—রাধে গো।"

সে সময়ে, সেই স্থানে, ঘটনা সম্বলিত, এ দুটী গান যে সুধাবর্ষণ করিয়াছিল, অনেক "মজলিস" দেখিয়াছি, অনেক সুগায়ক সুগায়িকার গান শুনিয়াছি, কিন্তু তেমনটী আর দ্বিতীয় বার কাণে বাজিল না, কি প্রাণেও লাগিল না। সঙ্গীত অবস্থা এবং সময়ে প্রীতিপ্রদ ও চিত্তোন্মাদক হইয়া থাকে।

অস্তগামী দিনমণি, ধীরে ধীরে বড় বড় গাছের মাথার উপর দিয়া তাঁহার বিশ্রাম গিরিতে আশ্রয় লইতেছেন। নিসর্গ দেব যেন সোণার টোপর মাথায় পড়িয়া অভ্যর্থনার আশায় ষ্টেশনে দণ্ডায়মান আছেন। পর দিন প্রত্যুষে মুক্তাগাছা রওয়ানা হইলাম।

"Uneasy lies the head that wears a crown"

বাড়ীতে আসিয়া পুনরায় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আবার লাঙ্গল চসিতে আরম্ভ করিলাম,—বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত হইলাম। একদা প্রাতে আমার জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়

* সাজিনা ফুল পাতাব শাশুড়ী তোর সনে।

আমার নিকটে আসিয়া, নানাবিধ আলাপ আপ্যায়িতের পর, আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া সোণার রঙ একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে; ছেড়ে দাও এ সব, ইহাতে এমন কি সুখ আছে, যে না হইলেই চলিবে না, আর তোমার শিকারে যাইয়া কাজ নাই।

আত্মীয়ের কথায় আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সুখ-দুঃখের কথা লইয়া তাঁহার সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। বস্তুতঃ সুখ কি? সুখ কিসে, সুধু একটা শব্দ দ্বারা তাহার মীমাংসা হয় না। তুমি হয়ত সরপুরীয়া, সীতাভোগ ইত্যাদি উপাদেয় খাদ্য গলাধঃ করিয়া অত্যন্ত সুখী, আমি উহার নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠি, মিষ্ট সামগ্রী আমার বিষবৎ। তুমি আমি দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শুইয়া যে সুখ উপভোগ না করি, ভুশয্যায় পড়িয়াই সংসারত্যাগী উদাসীন ততোধিক সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তুমি, বচনবাগীশ, বাক্যের উপর বাক্য জাল বিস্তার করিয়া মনের ঝাঁজ মিটাইতে পারিতেছ না, কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পার না, কিন্তু, ঐ মৌন ব্রতধারীর প্রতি চাহিয়া দেখ, সে একটী মাত্র বাক্য প্রয়োগ না করিয়া মনে মনে কি সুখ শান্তি উপভোগ করিতেছে। অর্থ, এক পদার্থ,—এক একজন, উহার এক এক রূপ ব্যবহারে সুখী, তুমি হয়ত যক্ষের মত অর্থরাশি আগুলিয়া, লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া, অতুল আনন্দে মগ্ন,—আর একজন, প্রাণ ভরিয়া উহা ব্যয় করিয়া, সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

অতএব সুখ বস্তুগত নহে, প্রবৃত্তিগত, মনের গঠনগত।

একে যাহাতে সুখী অন্যে তাহাতে অসুখী ;—বৈশেষিক দর্শনে, ইহার অতি সুন্দর একটি মীমাংসা দেখা যায় ;—

"পরিব্রাট্ কামুক শুনমেকস্যাং প্রমদা তনোঃ,
কুণপ কামিনী ভক্ষং ইতি তৃস্রো বিকল্পনা।"

এক নারী দেহ,—পরিব্রাজক, কামুক এবং কক্কুর এই তিন জীব তিন ভাবে সুখী। পরিব্রাজক ভাবেন, এই নারী রাক্ষসী সমান, ইহার হাত হইতে যত দূরে থাকা যায়, সংসারে, ততই অধিক সুখ ;—কামুক ভাবে, এমন সুখের সামগ্রী আর বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে দুটি নাই ; যতক্ষণ ইহার সঙ্গ-উপভোগ করা যায় এ জীবনে ততই সুখ ;—আর, কক্কুরভাবে, বাহবা! মরি মরি, কি সুকোমল নধর দেহ, এই নারী দেহটি পেট ভরিয়া ভোজন করিতে পারিলে যে সুখ, জগতের অন্য কোন খাদ্যে তত সুখসম্ভোগ হয় না! ইত্যাদি বিষয় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলে বেশ দেখা যায় ; একের পক্ষে যাহা সুখের, অন্যের পক্ষে তাহা অতীব দুঃখের কারণ। বড় ধনী, অট্টালিকায় বাস,—হাতী ঘোড়া, দাস দাসী, অমাত্যবান্ধবে পূর্ণ সংসার ; দিবানিশি টাকার ঝন্‌ঝনি, সোণাদানার কণ্‌কণী ; কিন্তু তাহার ভিতরে, হৃদয়ের অন্তস্তলে চাহিয়া দেখ, ভয়ানক মরকাঁদুনী! শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে অম্বল, মুখে অরুচি, মস্তিষ্কে অশান্তির তীব্র অনল দাউ দাউ জ্বলিয়া তাহাকে পুড়িয়া খাক্ করিয়া ফেলিতেছে! হয় ত এক দিকে তাহার প্রজা বিদ্রোহী, আর এক দিকেও পাঁচ লক্ষ টাকার একখানা খৎ তমাদি হইয়া গিয়াছে ; অজম্মায় খাজানা আদায় একেবারে বন্ধ ; কিম্বা

তাহার একটি মাত্র পুত্র ছিল, সে হঠাৎ মারা পড়িয়াছে, ধনৈশ্বর্য্যে তাহার পুত্র রক্ষা করিতে পারে নাই ইত্যাদি।

এখানে একটি গল্প মনে পড়িল ;—বালককালে গোদা পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে যখন ভবিতব্য সম্বন্ধে উপদেশ সঞ্চয় করিতেছিলাম, তখন তিনি একটি গল্প করেন ;—

কোন এক বড় লাটের একটি মাত্র পুত্র ; দৈব-ঘটনায় সে পুত্রটি মারা পড়ে ; লাট সাহেব পুত্র শোকে আচ্ছন্ন, কাম্‌ড়ার জানালা সাঁসি বন্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া আছেন, দুই তিন দিন চলিয়া গেল, দরজা খোলেন না; চাপ্‌রাসী খান্‌সামারাও কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না, শোকে মুহ্যমান! জঙ্গী লাট সাহেব এই সংবাদ পাইয়া, কেল্লার সমস্ত ফৌজ সুসজ্জিত করিয়া লাটের বাড়ী উপস্থিত হইয়া জঙ্গী সাহেব লাটের সহিত দেখা করিলেন। লাট সাহেব তাঁহাকে যুদ্ধ সাজে সুসজ্জিত দেখিয়া এবম্বিধ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জঙ্গী লাট উত্তর করিলেন ;—আপনার পুত্র মারা গিয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া আমি আমার অধীনে যত সৈন্য সামন্ত ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ; অনুমতি হয়ত যুদ্ধ করিয়া আপনার পুত্র ফিরাইয়া আনি।" জঙ্গী লাটের কথা শুনিয়া লাট সাহেব শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া গাত্রোত্থান করিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,— "তুমি কি পাগল হইয়াছ ? পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে আর তুমি ফিরিয়া আনিবে কি প্রকারে ?" মাথা হইতে টুপি নামাইয়া তদুত্তরে জঙ্গী লাট বলিলেন ;—"প্রভো, তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে ; আমি খ্যাতনামা সেনাপতি ; আমার

অধীনে এত সুদক্ষ সেনানায়ক, এত সৈন্য, এত কামান বন্দুক, এত গোলাবারুদ ; মোট কথা কিছুরই অভাব নাই, ইহা সত্ত্বেও যদি তোমার পুত্র ফিরাইয়া আনিতে পারিব না, ইহাই তোমার স্থির বিশ্বাস ; তবে তোমার ন্যায় জ্ঞানী লোকের এই তিন চারি দিন বিছানায় পড়িয়া মোহাচ্ছন্ন থাকায় লাভ কি ? পুত্র যে স্থানে গিয়াছে সে দেশ হইতে যখন কেহ কাহাকে কখন ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই, তখন তোমার এ শোক বৃথা। এখন নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ কর।" ইহাতে দেখা যায়, ধনে জনে, সুখ নাই ; অর্থও সুখের কারণ নহে ; সুখ মনে, মনের নিভৃত প্রদেশে ;—

"কারে বল সুখ মন ! কার্ সাধনায়,
কণ্টক-পূরিত এই বিশাল জগতে
ভ্রমিতেছ দিবানিশি আশাছলনায়
দুখের পসরা লয়ে, পারি না বুঝিতে।
জানি না, এ সংসারের কোন্ গুপ্তদেশে,
কোথায় লুকায়ে আছে যারে বল সুখ।
আমি দেখি রাজা প্রজা দীন নির্ব্বিশেষে,
কেবলি দুঃখের বোঝা বহিয়ে বিমুখ !
সুখ ! সে যে কিছু নয়—মেঘের বিজলী,
ক্ষণিক চমক মাত্র দেখায়ে লুকায়।
আশার দুকূল ভাঙ্গি, দুঃখঊর্ম্মিগুলি,
হৃদয়ের স্তর দিয়া কর্ম্মনাশা ধায়।
এমন যে সুখ, যাক্ দূরে চলে যাক্,
আমার যা নিত্য দুঃখ তাই থাক্ থাক্।"

রাজা হউক, প্রজা হউক সুখ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে নাই। এই বহির্জগতের সুখ, সুখ নহে, ও কেবল একটা ক্ষণিক কল্পনার বিদ্যুৎস্ফূরণ মাত্র। আমিও দৃঢ় বুঝি, সুখ থাকে ত আছে, এক সেই ভগবানের আরাধনায়, সংসার আবল্য ত্যাগ করিয়া যদি মনকে নিয়োজিত করা যায়, তাহাতে। এই জনকোলাহল পূরিত ভবের হাটে আর কোথাও সুখ নাই, আর কোথাও শান্তি নাই। এই দুঃখের বাজারে ধনী, দীন, সবল, দুর্ব্বল সকলেই আমরা কম বেশ মোহের পসরা মাথায় লইয়া বাসনার দ্বারে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছি।

"যো বৈভূমা তৎসুখংনাল্পে
সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।"

ইতি ছান্দোগ্যোপোনিষৎ।

ভূমা অর্থাৎ যাহা পরিপূর্ণ (পরমেশ্বর) তাহাই প্রকৃত সুখ, তাহা ভিন্ন জগতে সুখ নাই।

সাড়াটা প্রাতঃকাল, আমার বিদ্যা-বুদ্ধিতে যতটা যোগাইল, আত্মীয়ের সঙ্গে এবম্বিধ সুখ দুঃখের তত্ত্ব গবেষণায় কাটাইয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম। কিন্তু মনে কেমন একটা জরদ্গব ভাব প্রবেশ করিল, মনটা যেন একটু উচাটন হইয়া রহিল।

দিবা অবসানে প্রাসাদের উপর সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছি, জঙ্গলী পারাবৎকুল ঝাঁকে ঝাঁকে নীলাকাশে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। প্রাসাদ অদূরে উচ্চচূড় শিবমন্দির এবং কালী মন্দিরের উপরে বসিয়া দু'একদল পায়রা, "বক্ বকুম" স্বরে ঘার ফুলাইয়া একে অন্যের সহিত আলাপ

করিতেছে, নিকটস্থ বৃক্ষে পাখীগুলি মনের স্ফূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিতেছে, কোনটি বা চঞ্চু উত্তোলন পূর্ব্বক অন্যটিকে আঘাত করিতেছে ; কোনটি বা পাখায় চঞ্চু গুটাইয়া চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছে ; বায়সগণ দলে দলে বৃক্ষে আশ্রয় লইতেছে, আর উড্ডীয়মান বায়সকুল "কাকা" রবে সঙ্গীকে ডাকিয়া কুলায় যাওয়ার উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে। এই সব দেখিতেছি, এমত সময় জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল ; তিন জন সাহেব, এজির্টন্, জয়েণ্ট এবং K সাহেব আসিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে আনিলাম, এবং যথাশিষ্টাচারে খোস্ খেয়ালে গল্প করিতে লাগিলাম। পরদিন প্রাতে, আমি যখন বন্দুক লইয়া লক্ষ্য স্থির অভ্যাস করিতেছিলাম, তখন আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া, খ্যাতনামা শিকারী K সাহেব তৎস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং কিছুকালে আমার বন্দুক ধরা-ছোড়ার হাবভাব লক্ষ্য করিয়া আমাকে বলিলেন,—"That's not the way to hold the gun" অর্থাৎ বন্দুক ধরায় এই প্রথা নহে। এই বলিয়া বন্দুকটি ধরিয়া, তিনি একবার আমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি বাহুর উপর বন্দুক রাখিতাম, কিন্তু তাঁহার উপদেশ অনুসারে, বন্দুক বাহুর উপর স্থাপন না করিয়া স্কন্ধ-দেশের মূলভাগে স্থাপন করিতে উপদিষ্ট হইলাম, আর বাম হাতে কঠিন ভাবে বন্দুক না ধরিয়া হাল্‌কা হাতে, হাতের পাঞ্জা ঠিক ব্রাকেটের মত সঙ্কোচ করিয়া তাহার উপর বন্দুক স্থাপন করিতে হইল। আমি শিকারের সময় পূর্ব্বে বামচক্ষু মুদ্রিত করিতাম ; কিন্তু বাম চক্ষু না বুজিয়া ডান



বন্দুক ধরিবার প্রণালী—১৮২ পৃঃ

চক্ষু বুজিয়া "নিশানা" করিলে, লক্ষ্য স্থির সহজে হয়, বলিয়া উপদেশ গ্রহণ করিলাম! পূর্ব্বে আমি নরম হাতে বন্দুকের কুন্দা ধরিতে অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু সাহেব তাহাতে বড় আশঙ্কার কথা বলিয়া, বন্দুক খুব শক্ত হাতে, বুকের দিকে চাপিয়া রাখিতে উপদেশ করিলেন ;—বলিলেন, তাহাতে পিছাড়ী মারার শঙ্কা থাকে না। অযাচিত ভাবে সাহেব আমাকে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করাতে আমি বড়ই বাধিত হইলাম, তাঁহার মত একজন প্রসিদ্ধ শিকারীর ঐরূপ উপদেশ, আমি বড়ই আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এই নূতন প্রণালী গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যা একেবারে ধুইয়া পুছিয়া পুনরায় নূতন "মক্স" করিতে হইল।

লোকের যাহা একবার অভ্যাস হয়, সে অভ্যাস দূর করা বড় কঠিন। এই নূতন অর্জ্জিত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে আমাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। পূর্ব্বের শ্রম সাধনা সকলই পণ্ড হইয়াছিল। অভিনব স্রোতের টানে সকলই ধ্বংসের মহাসাগরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শিকারী হইয়াছি বলিয়া এতদিন মনে মনে যে একটা গর্ব্ব ছিল, এখন দেখিতেছি, সব ভুঁয়া, সকলই বৃথা। কুশিক্ষায় পণ্ডশ্রম করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি; আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, যে সুযোগ পাইয়াছি, যে অনুকূল বাতাস প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে শিক্ষার পাল টানিয়া সাধনার তরীখানা ভাসাইয়া দিতেই হইবে! কার্য্য যতই কঠিন হউক না কেন; সাধনায় অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। কবি বলেন ;—

"নাহি ফলে সাধনায়,
নাহি হেন কাজ,—
অমরত্ব মিলে সাধনে।"

কবির এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"যাদৃশীভাবনা যস্যঃ
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"—

আমি এই শ্লোকের একটু পরিবর্ত্তন করিয়া,—"ভাবনা" কথাটা উঠাইয়া—"সাধনা" কথা বসাইতে চাই; কারণ আমার এখন যে কার্য্য, তাহার জন্য কেবল ভাবনা করিলে, কিছুই হইবে না; মনে প্রাণে, হাতে কলমে সাধনা না করিলে সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

ভাবনা আছে, কিন্তু উদ্যম নাই বলিয়াই বাঙ্গালী আমরা এত অপদার্থ হইয়া পড়িতেছি। সকলের মনেই যেন কেমন একটা ভাবান্তর আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; পূর্ব্বের বাঙ্গালা আর এখনকার বাঙ্গালা যেন এক দেশ বলিয়া মনে হয় না, পূর্ব্বের বাঙ্গালী আর এখনকার বাঙ্গালী যেন সেই একটি জাতি নহে। বাঙ্গালীর সে উদ্যম নাই, সে শ্রম-সহিষ্ণুতা নাই; সব দিকে ভাবান্তর, সব ভাবনা নিমগ্ন; অথচ বাহিরে যেন কি একটা অজ্ঞাত অপরিচিত মুখস্ পড়িয়া, নিজ নিজ স্বায়ত্ব চাপিয়া রাখিতেছে। যে দিক দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখিতে পাওয়া বাইবে, সমুদয় লোকের প্রাণ গাঢ় অন্ধকার ছায়ায় আচ্ছাদিত। পল্লীর দিকে চাও, দেখিতে পাইবে, সব উদ্যমবিহীন জড় ভাবাপন্ন; সে উৎসব নাই, সে

আমোদ নাই, সে অধ্যবসায় নাই, আছে কেবল ভাবনা, কল্পনা আর জল্পনা। "হইতেছে" "হইবে" "যাইতেছি" "যাইব" ব্যস্ত কি?" ইত্যাদি ছাড়া "সাধনায় সিদ্ধি" বাঙ্গালায় এখন আর নাই; অলসতার অতলজলে সব ডুবিয়া গিয়াছে। জানি না, ভগবান, কবে, এই নিমজ্জিত জাতিকে উদ্ধার করিয়া তুলিয়া লইবেন!

এই সুযোগে সাধনা ছাড়িলে আমার সমস্তই বিফলে যাইবে কথাটা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বন্দুক সাধনায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইলাম। উপযুক্ত শিক্ষকের উপদেশে এবং খুব তীব্র সাধনায়, আমি যে কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলাম, পাঠক পর্য্যায়ক্রমে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। আগে কার্য্য,—পরে ফল। ফলভোগান্তে তৃপ্তি বা যশ, সে ত সহজসাধ্য, আপনিই নর ভাগ্যে ফলিয়া থাকে। অতএব, "সে পরিচয় আজ—অলমধিক মিতি।"

সাহেবের উপদেশ অনুসারে চাঁদমারীর কার্য্য শেষ করিয়া, চা-খাওয়ার টেবিলে মাত্র বসিয়াছি, এমত সময় সতর আঠার বৎসরের একটি বালক আসিয়া সংবাদ জানাইল;—তাহাদের বাড়ীর নিকট বাঘে একটি বাছুর মারিয়াছে। সাহেবগণ, এই সংবাদ শুনা মাত্রই আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন এবং তখনই বাঘ মারিতে বাহির হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বেলা আটটা। অনতিবিলম্বে সকলেরই ঘোড়া প্রস্তুত হইল। আমরা জলযোগান্তে শিকারে বাহির হইলাম।

মুক্তাগাছা হইতে আমাদের শিকারের স্থান,—"কুমার-

গাতা” তিন মাইলের বেশী ব্যবধান নহে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইয়া, শিকারভূমিতে প্রবেশ করিলাম। গ্রামের মধ্যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। পুকুরটি স্থবর্ণখালীর সড়কের উত্তরপূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত। পুকুরের চারি পাড়ে বট, অশ্বত্থ, আম, বেল প্রভৃতি বড় বড় গাছ; নিম্নস্তরে বেত ও ঘন কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল, ঐ জঙ্গলের মধ্যে নেকৃড়া বাঘ বাছুর মারিয়াছে। আমরা শিকারী কয়জন, কেহ সড়কের উপর, কেহ পুকুরের পাড়ে, বন্দুক হস্তে করিয়া দাঁড়াইলাম। আমি নূতন শিকারী স্থতরাং নিজ জাহানের সতর্কতার জন্য,— নিকটস্থ এক পেয়ারা গাছের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গ্রামের লোক জন, লম্বা লম্বা লাঠি লইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে জঙ্গল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল।

তাহাদের ঐরূপ উৎপাতে বাঘটির শান্তিভঙ্গ হওয়ায়, সে গুরুচরণ বিন্যাসে আস্তে আস্তে সড়কের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি গাছের উপর উচ্চ স্থানে থাকায়, বাঘের গতিবিধি স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিলাম। কিন্তু বন্দুক তুলিতে সাহস হইল না। আমি নূতন মক্স করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যদি লক্ষ্য ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে, অগ্রসর না হইয়া, পশ্চাৎ দিকে হটিয়াও বা যাইতে পারে। খুব সম্ভব, যাহারা জঙ্গল ভাঙ্গিতেছিল, তাহাদের উপর গিয়া চড়াও করিতেও পারে। স্থতরাং আমি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাঘের গতিবিধির তামাসা দেখিতে লাগিলাম। বাঘ আরও একটু অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া যে স্থানে K সাহেব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে লাগিল। সাহেব

সতর্ক লোক, তাঁহার লক্ষ্যস্থির ছিল। যেমনি ব্যাঘ্র ঠিক হইয়া দাঁড়াইল—"গুরুম্" করিয়া আওয়াজ করিলেন। গুলি বাঘের স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইল, বাঘও এক লম্ফ দিয়া ভীষণ চীৎকারে পলট খাইয়া ভূমিতে পড়িল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা সমস্ত কার্য্য ফতে করিয়া, মুক্তাগাছা প্রাসাদে রওনা হইলাম। জন কত কুলী বাঘ লইয়া আমাদের অনুসরণ করিল।

বিধাতার সৃষ্টিতে মানুষ সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আছে, চিন্তাশক্তি আছে, এবং শিক্ষা আছে। তদ্দ্বারা মানুষ অনেক কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ। মানুষের বিশেষ গুণ, তাহারা সাধনার অধীন, সেইটুকুই বস্তুতঃ মানুষের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কর্ম্মফল কি অদৃষ্ট যদি সেই প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তাহা হইলে মানুষের শিক্ষা কি সাধনা বড় স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতে অবকাশ পায়না। এই অবস্থায় মানুষের কর্ত্তব্য,—দৃঢ়তা অবলম্বন; অপারগতায় দুঃখিত বা বিচলিত না হইয়া,—

"Act act in the leaving Present,
Heart within and God o'ver head"—

দৃঢ়তা সহকারে, মানুষের কর্ম্মে মনোনিবেশ করা অধিকতর কর্ত্তব্য।

"যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষ"—সাধনায় যদি সিদ্ধি লাভ অদৃষ্টবশে একান্ত নাই ঘটে; তবুও মনকে প্রবোধ দেওয়ার এই থাকে;—আমার যত্ন চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না, প্রাণপণে সাধনা করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈব

অপ্রতিহত। দৈব-বিড়ম্বনায়, একবার হয় ত বিফলপ্রযত্ন হইয়াছি, কিন্তু সময়ে হয় ত এক দিন না এক দিন, দৈব সাধনার অধীনতা অবশ্যই স্বীকার করিবে। আমি যতদূর বুঝি; দৈব বলিয়া অবশ্য একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই; নতুবা, এক মাতৃগর্ভেরই সন্তান, আমি রাজা আর তুমি ভিখারী কেন? আমার পাতে ক্ষীর সর, তোমার পাতে শাক অন্ন; আমি সবল তুমি দুর্ব্বল ইত্যাদি দ্বৈধভাব কেন? দৈব অবশ্যই আছে; কিন্তু দৈব যে অনেক সময় সাধনার বশীভূত, ইহাও অস্বীকার করার বিষয় নহে, পুথীগত দৃষ্টান্ত এই বিষয়ে বিস্তর, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিনিয়ত চক্ষের সম্মুখে আমরা দেখিতেছি। এক অধ্যবসায়শীল গরীবের ছেলে; দুই তিন বার ব্যবসা করিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই, কিন্তু আর একবারে সে ক্রোড়পতি। এক জন ওকালতী পাশ করিয়া, বার লাইব্রেরীতে গল্প করে, খবরের কাগজ পড়ে কিম্বা ঘুমায়; আর এক জন উদ্যমশীল, কর্ম্মঠ; মক্কেলের জ্বালায় অস্থির, ল-রিপোর্টারের স্তূপ তাহার শয্যা। লক্ষ টাকা তাহার বার্ষিক আয়! অপর একজন হয় ত সেই দূরদেশে আফ্রিকার পর্ব্বত গুহায়, স্বর্ণখনি পাইয়া এক বৎসরের মধ্যে সাত রাজার সমান। আমাদের পূর্ব্ব বাঙ্গালায় একটা ডাকের কথা আছে;—

"ঘুমায় আইল্‌সা গাছের তলে,
ভাত খায় কলার পাতে;
কর্ম্মা দৌড়ায় টাট্টু ঘোড়া,
খায় সোণার থালে।"

ইহার, অর্থ, আর কিছু নহে; নিশ্চেষ্টতা নিন্দনীয়; পুরুষকার গ্রহণীয় এবং শুভ ফলপ্রদ। এখানে একটি গল্প মনে পড়িল,—গল্পটি অদৃষ্ট এবং কর্ম্মবাদের অতি সুন্দর সমন্বয়ীকৃত উদাহরণ।

একটি বালকের খুব বিদ্যা হইবে বলিয়া কোষ্ঠীতে লিখা ছিল। বালক বড়ই অশান্ত, কিছুতেই লেখা পড়া করে না, তাহার পিতা মাতাও তজ্জন্য তাহাকে কিছু বলে না; তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যখন অদৃষ্টে বিদ্যা আছে বলিয়া কোষ্ঠীতে বলে, তখন নিশ্চয়ই বিদ্যা হইবে; তাহারা ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দিকে বালকের এবম্বিধ হাব ভাব দেখিয়া বিদ্যাদাত্রী বীণাপাণি বড়ই চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িলেন,—বালকটিকে কি ভাবে বিদ্যা প্রদান করেন। একদিন অপরাহ্লে ঐ বালক একটি পাহাড়ের নীচে বসিয়া আছে, অদূরে পর্ব্বত গাত্রে সরস্বতী রূপান্তর পরিগ্রহণান্তর প্রস্তর উপর দিয়া লাঙ্গল চসিতে আরম্ভ করিলেন। বালক এই ব্যাপার দেখিয়া সরস্বতীকে বলিল;—"তুমি এ কি কর, পাহাড়ের গায়ে লাঙ্গল চসিয়া কি হইবে?" বালকের কথায় লাঙ্গল ছাড়িয়া দেবী বলিলেন;—বৎস! চেষ্টা করিলে এই পাহাড়ের গায়েও প্রচুর শস্য জন্মান যায়; কিন্তু চেষ্টা নাই বলিয়াই এই পাহাড়, প্রস্তরময়, নীরস কঠিন, এবং কৃষির সম্পূর্ণ অযোগ্য। বালক, তোমার অদৃষ্টে বিদ্যা ছিল, কিন্তু তোমার চেষ্টা নাই, গতিকেই তুমি চির-জীবন মূর্খ হইয়া থাকিবে! তোমার অদৃষ্টে বিদ্যা ছিল, সামান্য চেষ্টা করিলেই বিদ্বান হইতে পারিতে, কিন্তু অলসতায় সব পণ্ড করিলে, তোমার বিদ্যা হইল না।"

এই গল্পেও বুঝা যায়, কেবল অদৃষ্ট মানিয়া নিচেষ্ট থাকিলে চলিবে না। অদৃষ্টের সঙ্গে সঙ্গে যত্ন চেষ্টা যোগ না করিলে, মানুষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সক্ষম হয় না। ইঞ্জিন চালাইতে, কয়লা ও জল এই দুটি জিনিষেরই প্রয়োজন, একের সাহায্যে যেমন ইঞ্জিন চলে না; চেষ্টা, তেমন অদৃষ্টের সঙ্গে জুড়িয়া না দিলে, যশ এবং প্রতিষ্ঠার কলও চলে না।

আমি আলস্য ত্যাগ করিয়া পুরুষকারের আশ্রয় লইলাম। একান্ত মনে বন্দুক সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম, পুনরায় নূতন প্রণালী অবলম্বনে, দেয়াল হইতে কাক, কাক হইতে কপোত, এবং কপোত হইতে ছোট ছোট পাখী গুলি-বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। এক দিন কাক-প্রত্যূষে বন্দুক অভ্যাস জন্য বাহিরে আসিলাম; তখন প্রভাত গগণের পূর্ব্বদ্বার উদ্ঘাটিত, তরুণ-অরুণ নীলাকাশে উদ্ভাসিত, বাটীর উদ্যানস্থ পাদপরাজি পুষ্পগুচ্ছে সমলঙ্কৃত, এবং মলয় সমীরণ কুসুম গন্ধে প্রমোদিত ও উদভ্রান্ত। বাগানের মালতী মাধবী, বেলা যুই প্রভৃতি ধীরে ধীরে পবনস্পর্শে আন্দোলিত হইতেছে। মনে পড়িল, রবি বাবুর ;—

"আয় আয় সখি, আয় এই বেলা,
মাধবী মালতী বেলা,
রাশি রাশি ফুটাইয়া,
কানন করিয়া আলা।
অই দেখ মলিন উথলিত হরষে,
অফুট মুকুল মুখে, মৃদু মৃদু হাসিছে।"

এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, খোস খেয়ালে দুচারিটি

কবুতর মারিলাম; এমত সময় আমার জনৈক পদাতিক এক খানা চিটি আনিয়া আমার হাতে দিল। পত্রখানা K সাহেব লিখিয়াছেন, তাঁহারা তিন চারিটি ইংরেজ বন্ধু সেই দিন মধ্যাহ্নে আমার এখানে আসিয়া ভোজন করিবেন, এবং অপরাহ্নেও আমার বাড়ীতেই অবস্থান করিবেন এই সংবাদ জানাইয়াছেন। সরকারকে ডাকাইয়া, তাহাদের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়া আমি পুনরায় বন্দুক অভ্যাস করিতে নিযুক্ত হইলাম।

আট কি সাড়ে আটটার মধ্যে আমার ইংরেজ বন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া নানারূপ গল্প-গুজবে সময় কাটাইয়া ১১টার সময় অহারান্তে সকলে বিশ্রাম করিলাম। অতঃপর, বিশ্রামান্তে চারিটার পর কিছুক্ষণ "বিলিয়ার্ড" খেলিয়া সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইলাম। কিয়দ্দূর ঘুড়িয়া ফিরিয়া গৃহে ফিরিতেছি, এমত সময় একটি কৃষক আসিয়া খবর দিল;—"নাঙ্গলিয়া" গ্রামে এক ঘাসবনের মধ্যে, বাঘে একটি বাছুর মারিয়াছে। জাণ্টু সাহেব এই সংবাদ শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন, এবং তখনই শিকারে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম;—এ সময়ে শিকার ভূমিতে গেলে, শিকার ত নিশ্চয়ই মিলিবে না; অধিকন্তু, শিকারটিকে দূর করিয়া দেওয়া হইবে। K সাহেব আমার মত সমর্থন করিলেন। কিন্তু জাণ্টু সাহেবের ভাবে বোধ হইল, তিনি বড় রুষ্ট হইয়াছেন। কারণ তাহার কিঞ্চিৎ পরেই তিনি বলিলেন,—

"তোমরা কি মনে কর, বাঘ আমাদের জন্য কালও বসিয়া থাকিবে?" জাণ্টু সাহেবের ঐ কথার কোন উত্তর না করিয়া, যে লোকটি ঐ সংবাদ আনিয়াছিল; তাহাকে নগদ আস্ত একটি টাকা পকেট হইতে দিয়া, বলিয়া দিলাম, কাল প্রাতে আমরা তথায় উপস্থিত হইব, এই সময় মধ্যে যেন কেহ সেখানে কোনরূপ গোলযোগ না করে, অর্থাৎ বাঘটির শান্তিভঙ্গ করিয়া কেহ না তাড়াইয়া দেয়। সেলাম করিয়া কৃষক চলিয়া গেল। আমরা আরও কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ী ফিরিয়া আমার শিকারী বয়কে, প্রত্যূষে শিকারে বাহির হইব বলিয়া, বন্দুকাদি প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিয়া বিদায় করিলাম।

"যার মনে যা, স্বপ্নে দেখে তা।" জাণ্টু সাহেবের আর বুঝিবা রাত্রে ঘুম হয় নাই; বাঘের চিন্তায়, নিদ্রাদেবী তাঁহার চক্ষে স্থান পান নাই; তাই রাত্র প্রভাত না হইতেই তিনি সকলকে ডাকিয়া তুলিয়াছেন। জাণ্টু সাহেব ঠিক আমারই মত নূতন শিকারী। তিনি আমার চেয়েও এক ডিগ্রী উপরে ছিলেন,—আমার দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল, তিনি ছিলেন "short-sighted"। তাঁহার উত্তেজনায় সকলেই শয্যাত্যাগ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে "চা" সেবন পূর্ব্বক, অশ্বারোহণে শিকারভূমি উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম।

শিকারভূমি নাঙ্গলিয়া পঁহুছিতে আমাদের বড় বেশী সময় বিলম্ব হইল না। কারণ মুক্তাগাছা হইতে ঐ স্থানটি বড় বেশী দূরে নহে। অনুমান আটটার সময় আমরা সেখানে পঁহুছিলাম। বন্দুক গুলি বারুদ আদি সরঞ্জাম সহ লোক জনের

সে স্থানে আসিয়া পঁহুছিতে একটু বিলম্ব হইল, এই সময়টুকু আমাদের তথায় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তথায় যে সমস্ত লোক জন আসিয়াছিল, জঙ্গল ভাঙ্গিতে তাহাদিগকে ঠিক করা হইল। বন্দুক সহ ভৃত্যগণ পঁহুছা মাত্র, আমি এবং জাণ্টু সাহেব বন্দুক লইয়া এক স্থানে দাঁড়াইলাম; K এবং D সাহেবও বন্দুক লইয়া অন্যদিকে দাঁড়াইলেন। কৃষকগণ, আমাদের নির্দ্দেশ অনুসারে জঙ্গল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। খুব সতর্ক ও ধৈর্য্যাবলম্বনে দাঁড়াইয়া আছি। জঙ্গল একটু নড়িলে চড়িলে, একটু সড়্সড়্ শব্দ হইলেই ব্যস্ত-বাগীশের মত বিচলিত হইয়া উঠি, এবং বন্দুক তুলিয়া মারিবার জন্য প্রস্তুত হই, কিন্তু পরে দেখি কিছু নহে। সর্সরাণী খচ্মচাণী সবই মনের ধান্দা। তখনই শালপ্রাংশু অবতার হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি। এই ভাবে, বাঘ আসে আসে করিয়া, কিছুকাল যেমন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি; এমত সময় হঠাৎ বাঘ দর্শন দিলেন। জাণ্টু সাহেব আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"There you are" ঐ দেখ বাঘ। দেখিলাম একটি নেকড়িয়া বাঘ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক, মুখবিকৃতি করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। অনুমান বাঘটি আমা হইতে পনর হাত দূরে আছে। আমিও বাঘটী দেখিয়া এত অধিক উত্তেজিত হইলাম যে, আমার বিবেচনা শক্তি লোপ হইল, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। "Oh my salad days—when I was green in Judgment" অমনি বন্দুক তুলিয়া ঘোড়া টিপিলাম। অসতর্কতার দরুণ, গুলির

নালে ঘোড়া না টিপিয়া ছড়ার নাল টিপিলাম, সমস্ত ছড়া বাঘের চখে-মুখে লাগায় বাঘটি ভীষণ চীৎকারে লম্ফ ঝম্ফ করিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্যের বিষয় বাঘের দুই চক্ষুই অন্ধ হইয়াছিল, তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সে এক স্থানে থাকিয়াই লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। আমাদিগকে আর আক্রমণ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হইল না। কিয়ৎকাল বাঘের এমন্বিধ তামাসা দেখিয়া, জাণ্ট্ সাহেবের হাতে গো হত্যা বিচারের ভার অর্পণ করা গেল। তিনি ফৌজদারী বিচারের কর্ত্তা, গো হত্যা অপরাধে ব্যাঘ্রটির প্রাণ দণ্ডই মঞ্জুর হইল, এবং সাহেব স্বহস্তেই ব্যাঘ্রটির শেষ দণ্ড প্রদান করিলেন।

গ্রামের লোকেরাই বাঘটি মুক্তাগাছা পঁহুছাইয়া দিবার ভার লইল। আমরা রওনা হইলাম। ব্যাঘ্র শিকারে বিজয়ী হইয়া আমরা গৃহে আসিতেছি; রাস্তায় K সাহেব, আমাকে উৎসাহিত করার জন্য, আমার বন্দুক চালানের অত্যন্ত প্রসংশা করিতে লাগিলেন, এবং বাঘের ঐরূপ ভাবে চক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়াটা বড়ই বাহাদুরী বলিয়া বর্ণনা করিলেন। কিন্তু আমি বুঝিলাম,—উহাতে প্রসংশা বা বাহাদুরীর বিষয় কিছুই নাই; উহা কেবল,—Nervousness এবং Excitement হওয়ার দরুণই হইয়াছে। তাহা না হইলে, বাঘটি যতটা দূরে ছিল, একটি গুলি মারিলেই সব শেষ হইত, শিকারের চুড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটিত। অন্য দিকেও দেখিতে গেলে, ছড়া মারা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছিল। যদি বাঘের চক্ষু অন্ধ না হইত, তবে আমাদের অত্যন্ত বিপদ ঘটিতে পারিত; খুব

সম্ভব, আমরা বাঘের আক্রমণে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইতাম। সে যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় যে, শুভ কুশলে সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়াগেল। "All's well, that ends well."

বর্ষাকাল। জলভারে আকাশ অবনত। মেঘগুলি চঞ্চল, বিদ্যুৎ ব্রীড়া অবনত নববধূর রক্তাঞ্চলবৎ ইতস্ততঃ চিক্‌মিক্ করিতেছে। সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে, ঝির্ ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; তর্ তর্ করিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমি হাত পা গুটাইয়া ভাবিতেছি,—এই ভাবে আর কত দিন থাকা যায়, কি ভাবে সময় কাটাই!

এইরূপ ভাবিতেছি,—এক দিন প্রাতে আমার জনৈক জ্ঞাতি বন্ধু (ভ্রাতা) আসিয়া বলিলেন ;—"চল ভাই, বড়শী শিকারে যাই।" যদিও ঐরূপ একটা অব্যাপৃত ক্রীড়া আমার কৌতুক উৎপাদন না করুক, তথাপি বন্ধুর সংসর্গে একটা দিন কাটিয়া যাইবে, ভূরিভোজনেরও ব্যবস্থা আছে ; স্বীকার করিলাম।

পরদিন প্রাতে গাড়ী চড়িয়া, মৎস্য শিকারে বাহির হইলাম। বর্ষাকাল অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার দরুণ রাস্তা ঘাট এরূপ কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে যে, ঘোড়ায় গাড়ী টানিতে পারিতেছে না, কখনও ঘোড়ায় টানে, কখনও বা মানুষে টানে, এইরূপ টানাটানি, ঠেলাঠেলী করিয়া বহু পরিশ্রমের পর প্রথম ষ্টেশন চেঁচুয়ার হাটে পঁহুছিলাম। তৎপর হাতীতে উঠিলাম, সমুদ্রে যেমন জাহাজ চলে, গজরাজ তেমনি হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। প্রথম ষ্টেশন হইতে দ্বিতীয় ষ্টেশনে যাইতে

রাস্তা নাই, মাঠ দিয়া যাইতে হইবে। মাঠ জলময়, একরূপ হাতী বাহিয়াই নয়টার সময় শিকার স্থান বড়গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

বড়গ্রামে কিঙ্কর মণ্ডল, বেশ একটু সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। আমার জ্ঞাতি বন্ধুরই প্রজা। বহির্ব্বাটীতে তিনিখানা চৌয়ারী ঘর, এক দিকে পূজাদি নির্ব্বাহ জন্য অতি সুন্দর পরিষ্কার চিত্র বিচিত্র একখানা মণ্ডপ গৃহ। বাড়ীর সম্মুখে পুষ্করিণী, সেই পুকুরেই আমরা মৎস্য শিকার করিব। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, পুকুরটিতে রোহিত মৃগাল এবং অন্যান্য জাতীয় অনেক মৎস্য আছে। পুকুরটির চারি পাড়ে পাদপরাজি এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, শাখাপল্লবে স্থানটি বেশ ছায়াযুক্ত। আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল, বাতাবিলেবু, দাড়িম্ব প্রভৃতি গাছ বেশ কাতারে কাতারে সুসজ্জিত ; তৎপশ্চাতে উচ্চ-চূড় বংশ-শ্রেণী দণ্ডায়মান, যেন উকি দিয়া সম্মুখস্থ বৃক্ষরাজির প্রতি সস্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

আজ বৃষ্টি নাই, আকাশ নীলবর্ণ। শুভ্র মেঘদল, বায়ু তরঙ্গে সাঁতার দিয়া, একের পেছনে অন্যে প্রধাবিত। একে অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, কোন স্থানে খেলার ছলে, একের সঙ্গে অন্যটি অঙ্গ মিলাইয়া দিতেছে। অতি সুন্দর ভাব,—সুন্দর দৃশ্য !

স্বর্গ কি জানি না ; নন্দন কি দেখি নাই ; যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, সবই কল্পনা প্রসূত। ভাল, এই কল্পনার পেছনে পেছনে দৌড়িয়া আমাদের লাভ কি ? বাস্তব যাহা আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান, তাহা দেখিলেই যথেষ্ট।

তাহাতেই আমাদের মন প্রাণ যে পরিমাণ শীতল হয়; পৃথিবীতে এমত কোন বিষয়, মানুষ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যাহাতে অন্ততঃ ততটুকু শান্তি প্রদান করিতে পারে! এই সংসারে, অভাব অভাব বলিয়া, আমরা অনেক সময় চীৎকার করি; কিন্তু অভাব কোথায়? পূর্ণানন্দ পরম পুরুষ পরিপূর্ণ করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; আমরা খুজিয়া পাই না,—নিজ কর্ম্ম-দোষে, নিজ নির্ব্বুদ্ধিতায়, এবং নিজেদের অলসতায়। বস্তুত, সংসার পূর্ণানন্দের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার। যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই স্বর্গ, সেই দিকেই আনন্দের উৎস! আমরা যখন ঐ পুকুরের পাড়ে কার্পেট সমতুল, শ্যাম-দুর্ব্বাদল উপরি উপবেশন করিলাম; আর পল্লবিত বৃক্ষশাখা প্রশাখা যখন শিরোপর চন্দ্রাতপের মত সুশীতল ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল; তখন কে বলিবে যে আমরা স্বর্গ উপভোগ করি নাই!—যথার্থই

"এই বিশ্ব মাঝে,
যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে তুমি
সাজায়ে রেখেছ॥"

পুকুরের চারি পাড়ে, পনর যোলটি ছিপ পড়িল। আমরা যে পাড়ে ছিলাম, সেখানে খুব ভাল মার্জ্জিত একটু সভ্য গোছের চারি পাঁচটি ছিপ ফেলিয়া আমার জ্ঞাতিবন্ধু দৃঢ় হইয়া বসিলেন। তন্মধ্যে দুটী ছিপ আমার কর্ত্তৃত্বের অধীন হইল। আমি একটী ছিপ নিকটে রাখিয়া, অন্যটী হাতে লইয়া বসিলাম।

বড়শীতে মৎস্য ধরিতে হইলে, অনেকটা সংযম, অনেকটা সহিষ্ণুতার প্রয়োজন; বিশেষতঃ বৃহৎ মৎস্য শিকারে অত্যধিক ধৈর্য্য চাই। বড় মাছগুলি দল বাঁধিয়া জল মধ্যে বিচরণ করে না; অধিকন্তু, উহারা অনেক জলের নীচে চরিয়া বেড়ায়, বেশী সময়ই জলাশয়ের তলায় খাদ করিয়া পড়িয়া থাকে। সুতরাং টোপটী যখন তখনই তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়িবার সম্ভাবনা কম। আবার দৃষ্টিপথে পড়িলেও তাহাদের আসিতে বিলম্ব হয়। ছোট মাছ যেমন টোপ দেখিলেই ত্বরিত গমনে আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে, বড় মাছ তেমন করে না। উহার চাল-চলন্‌টা নবাবী রকমের। সেই 'ঢিমা তেতালার' চালে টোপের নিকটস্থ হইয়া, কি জানি সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ করে,—ইতস্ততঃ করে। এইরূপ বিবেচনার পর তাহার মেজাজ সরিপ্‌ টোপের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে আসিয়া টোপটীতে তিনি ঠোকর দিতে থাকেন।

ব্যাপারটা নেহাত সামান্য নয়। অরণ্যচারী যোগী যেমন বর লাভের কামনায় ইষ্ট দেবের আবির্ভাব প্রতিক্ষায় যোগাসনে বসেন; বাসর ঘরের বর যেমন দ্বারদেশে নববধুর পদলগ্ন মঞ্জীর ধ্বনি শ্রবণ লালসে সেই দিকে কাণ পাতিয়া শয্যালগ্ন থাকে; বিল পাড়ের বক যেমন ভাসা মাছের আশায় খাপ্‌ পাতিয়া নীরবে বসিয়া থাকে; বড়শী শিকারীরও তেমনই ছিপটী হাতে লইয়া, তরঙ্গের দিকে নির্ণিমেষ নয়নে এক দৃষ্টে চাহিয়া, নীরব নিস্পন্দে বসিয়া থাকিতে হয়। অরণ্যচারী যোগী, বাসর ঘরের বর, বিল পাড়ের বক, এবং পুকুর পাড়ের বড়শী শিকারী, এ চারি জনই ধ্যানপরায়ণ। প্রভেদ এই যে,

যোগী নিমীলিত নেত্রে, বর ক্বচিন্নিমীলিত ক্বচিদুন্মীলিত নয়নে, বক ইষদুন্মীলিত চক্ষে আর বড়শী শিকারী একেবারে উন্মীলিত পদ্ম-লোচনে ধ্যানস্থ হয়। তাই বলি, বড় বড় মৎস্য শিকার একটু সাধনা সাপেক্ষ। কিন্তু সাধনা যতই কষ্টদায়িনী, সিদ্ধি তদধিক সুখপ্রদা। অভীষ্ট বরলাভে যোগীর যত না আনন্দ, বাসর গৃহ দ্বারে বধূর মঞ্জীর ধ্বনি শ্রবণে বরের যত না আহ্লাদ, জলে মাছের ভাসান দেখিয়া বকের যত না উল্লাস, মাছ টোপে ঠোকর দিলে বড়শী শিকারীর তদধিক আনন্দ, তদধিক উল্লাস।

সত্য কথা বলিতে কি, ছিপ হাতে করিয়া এরূপ অস্তিত্ব শূন্য অবস্থায়, মরা মানুষের মত অপলক চক্ষে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা,—মাপ করুন, অতটা স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য, অতটা কঠোর সংযম আমার তখনও অভ্যস্ত হয় নাই। আমার শিকারের অভ্যাস—দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি। মাছের আশায় মাছরাঙ্গার মত এক স্থানে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকা আমার কাজ নহে। সুতরাং আমার হাতের ছিপটা জ্ঞাতি বন্ধুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, তীরে, যেখানে বসিয়া কয়েকটী বাবু দাবা খেলিতেছিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, এক পক্ষ অবলম্বন করিলাম, এবং বিপক্ষকে কিরূপে 'মাৎ' করিতে পারি, তাহারই পন্থা খুজিতে লাগিলাম। এখানে হাতী ঘোড়ায় নৌকায় বেশ যুদ্ধ চলিল ও মারামারি হইতে লাগিল।

আমি যখন এই বিগ্রহ ব্যাপারে একান্ত নিবিষ্ট, আমার জ্ঞাতি-বন্ধু তখন অতি ত্রস্তে উত্তেজিত স্বরে ডাকিলেন,—

"সূর্য্যকান্ত।" আমি একলম্ফে ছুটিয়া তাঁহার কাছে গিয়া দেখি,—আমার বড়শীর ছিপটী তাহার হাতে, জল হইতে একটু উত্তোলিত; জলের নীচে থাকিয়া, মাছ সূতটা টানিতেছে। বন্ধু ছিপটা আমার হাতে দিলেন। আমি মাছটী লইয়া খেলিতে লাগিলাম এবং কিয়ৎকাল খেলা করিয়া তীরে উঠাইলাম—একটী মাঝারি রকমের রোহিত মৎস্য।

উপবাস অপেক্ষা পারণা ভাল, রান্না অপেক্ষা তৈয়ারি অন্ন ভোজনে সুখ, ফাৎনা পাহারা অপেক্ষা মাছ বাঁধাইয়া দিলে, খেলিতে সুখ, তদপেক্ষা সুখ উহাকে তীরে উঠাইতে, আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ—উহার উপাদেয় ব্যঞ্জন ভোজনে। আমার আগ্রহ বাড়িল। অনতিবিলম্বে আবার ছিপ ফেলিয়া বসিলাম। সে দিন সাকুল্যে দশ বারটী মৎস্য সকলে মিলিয়া শিকার করিলাম।

অন্য শিকারে যত না হউক, মৎস্য শিকারে আমি এক-বারেই নূতন ব্রতী, সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বিষয়ে ততটা অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু মৎস্য শিকারীর মুখে শুনিয়া এবং মৎস্য শিকার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে কিছু জ্ঞান লাভ না করিয়াছি তাহাও নহে। সহজজ্ঞান সকল বিষয়ই সত্বরে আয়ত্ত করিতে পারে। এইক্ষণ এই মাছটী ধরিয়াও কৌশল কতকটা শিখিলাম। সুতরাং এ সম্বন্ধে নিরেট মূর্খ নহি। বৃহৎ মৎস্য শিকারে দুফলা বড়শীই অধিক কার্য্যকরি হইয়া থাকে। বড়শীটি খুব বড় বা অতি ছোট না হইয়া, মাঝামাঝি হইলেই ভাল হয়। সূতা সূক্ষ্ম অথচ খুব শক্ত হওয়া বড় দরকার। ছিপটা নমনীয় হওয়া চাই, অর্থাৎ টানের সঙ্গে

সঙ্গে নুইয়া পড়ে, তবে মাছের সঙ্গে খেলিতে পারা যায় এবং বড় মাছ আটকান যায়। বড় মৎস্য যখনই বড়শী-বিদ্ধ হয় এবং উপর হইতে টান পড়ে, তখন সে প্রাণপণ জোড়ে মহাবেগে উন্মত্তের মত চোট করে। শক্ত ছিপে কদাচিৎ সে চোট সামলান্ যায়, সূতা ছিঁড়িয়া মাছ প্রস্থান করে। নরম ছিপে মাছের ভাবে ভাবে খেলিতে পারা যায়, সূতা সহসা ছিঁড়িতে পারে না। মৎস্য শিকারী স্বেচ্ছা মত নানা টোপ ব্যবহার করিয়া থাকে; যথা,—ময়দার টোপ, চাউলের টোপ ইত্যাদি। কিন্তু বড় মাছ ধরিতে, ছোট মাছের টোপই অগ্রগণ্য। বড় মাছ ছোট মাছকে ধরিয়া আহার করে, ইহা সকলই জানে; কিন্তু ছোট মাছ পাইলেই যে বড় মাছে উদরস্থ করিয়া বসিবে, এমত নহে। তাহা হইলে বড় মাছে ছোট মাছে একত্রে এক জলাশয়ে বসতি করা অসম্ভব হইত। পুষ্করিণী ইত্যাদিতে কখনই ছোট মাছ দেখা যাইত না। এবং এই জগতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের একত্র স্থান হইত না। ছোট হউক, বড় হউক প্রকৃতি সকলকেই জীবন দিয়াছেন এবং জীবন রক্ষার ও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছোট মাছগুলি দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, সে দলে কোন অত্যাচার করিতে, বড় মাছ সাহস পায় না, ভয় করে। যে রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছোট মাছ দল ছাড়া হইয়া পড়ে, তাহাকেই বড় মাছে আহার করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র জীব মাত্রই দল বাঁধিয়া থাকে এবং সকলে মিলিয়া কার্য্য করে। অতি ক্ষুদ্র কীট পিপীলিকা সাইর বাঁধিয়া চলে ফিরে এবং আহার্য্য সংগ্রহ করে। কোন পথে খাদ্য পাইলে,

দলে দলে পিপীলিকা আসিয়া সেখানে তুঙ্গাকার হয়। এবং সকলে মিলিয়া নির্ব্বিবাদে তাহা ভাগ করিয়া লইয়া যায়। পথিক সেই তুঙ্গীকৃত পিপীলিকার উপর পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে সাহস পায় না, উল্লঙ্ঘন করিয়া অথবা সরিয়া যাইতে হয়। অসাবধানতা বশতঃ ঐ পিপীলিকা স্তূপে তাহার পদ সংলগ্ন হইলে, সহস্র সহস্র পিপিড়া কামড়াইয়া তাহার পদ ক্ষত বিক্ষত করে, পা ফুলিয়া উঠে, বিষের জ্বালায় শরীর অস্থির করে। একতার পর আর শক্তি নাই, একতা মহাশক্তি। মানব! তুমি বিদ্যা বুদ্ধির আত্মশ্লাঘা কর, তোমার আসন সকল জীবের উপরে বলিয়া, অহঙ্কার কর; আর ঘরে ঘরে, পড়সী পড়সীতে গলাবাজী করিয়া বিচ্ছিন্ন হও, তোমার ধন পরে আসিয়া অপহরণ করে, তোমার মুখের গ্রাস পরে আসিয়া কাড়িয়া লয়, তুমি অনশনে মর; ধিক্ তোমায়! যদি সংসারে থাকিতে চাও, এই ক্ষুদ্র জীব গুলিকে, গুরু স্বীকার করিয়া তাহাদের নিকট "একতা" মন্ত্রে দীক্ষিত হও।

বলিয়াছি বড়শীতে মাছের টোপই প্রশস্ত। কিন্তু কি মাছ লইয়া টোপ করিতে হইবে, এ বিচারে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। কোন্ মাছ কোন্ মাছে ভালবাসে এ রহস্য ভেদ করা সহজ নয়, বড় বড় মৎস্য শিকারী পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। এক জন বড় মৎস্য শিকারী হেন্‌রি সলিবান টমাস, তিনি মাছের পেট কাঁড়িয়া, ভুক্ত মৎস্য বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। জীবন্ত ছোট মাছ মারিয়া টোপ করাই সঙ্গত; কিন্তু মাছটী মারিতে

একটু কৌশল চাই। আছড়াইয়া বা কিলাইয়া বা ঠেঙ্গাইয়া মাছটা মারা উচিত নহে। মাথার নীচে আঙ্গুলে টিপ দিয়া, এ ভাবে মারিতে হইবে যে মাথাটা থেঁত্‌লাইয়া না যায়। মাছটী বড়শীতে গাঁথিতেও একটু বুদ্ধি খাটাইতে হইবে। বড়শীটা গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া মুখ পর্য্যন্ত আনিতে হইবে। কাহারও কাহারও ধারণা, যত বড় টোপ তত বড় মাছ। আমি তা স্বীকার করি না। আমরা যত বড় হা করিতে পারি, গ্রাসটা কি তত বড় করিয়া থাকি? ছোট ছোট টোপে অনেক বড় বড় মাছ ধরিতে দেখিয়াছি। তবে টোপটা বড় হইলে ছোট মাছ গিলিতে পারিবে না, সরিয়া যাইবে, আর বড় মাছ আসিয়া উহা গ্রাস করিবে, এ একটা অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু সেটা ভুল। অনেক ঠোক্‌রাণে ছোট মাছ তাহার আকার অপেক্ষা বৃহৎ টোপ ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া আহার করিতে দেখা যায়। আমার বিশ্বাস টোপ ছোট হইলেও, যদি উহা বড় মাছের দৃষ্টির গোচরে পড়ে, আর উহা খাইতে তাহার ইচ্ছা হয়, তবে টোপের নিকটস্থ লোলুপ ছোট মৎস্যগুলিকে তাড়াইয়া, সে আসিয়া ধরে। অনেক সময়ে দেখা যায়, বৃহৎ মৎস্য অতি দেমাকের সহিত টোপের পানে অগ্রসর হয় এবং ধীরে আস্তে উহা গ্রহণ করে। তাহার এইরূপ আচরণের এই ভাব যেন, কোন ক্ষুদ্র মীন তাহার অভিলিপ্সিত আহার গ্রহণে সাহসী না হয়। তাহার চক্ষে এমনই একটা ধীর গম্ভীর দৃষ্টির সঞ্চার হয় এবং পুচ্ছ-চালনা এমনই সক্রোধে করে যে, ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি তাহার অর্থ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করে এবং তৎক্ষণাৎ টোপ হইতে

সরিয়া পড়ে। আর যদি টোপ গ্রহণে তাহার অনিচ্ছা থাকে, তবে এরূপ কোন ভাব প্রকাশ করে না। ক্ষুদ্র মৎস্যে এ সঙ্কেতও বুঝিতে পারে। এ অবস্থায় তাহারা নির্ভয়ে আসিয়া টোপটী নিজেরাই আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। টোপ গ্রহণেচ্ছু বড় মাছের আকারে ও মুখে এমন একটা প্রতাপান্বিত ভয়সঞ্চারী ভাব ব্যক্ত হয় যে, তাহা দেখিলেই ছোট মাছগুলি শঙ্কুচিত চিত্তে তফাৎ হইয়া দাঁড়ায়।

লোকে কথায় বলে—"পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।" উপরে যেরূপ বলা হইল, বড় মাছের এত প্রতাপ সত্ত্বেও, অনেক ছোট মাছ পেটের জ্বালা সহ্য করিতে পারে না, কখন কখন টোপটী আসিয়া ধরে। অমনি বড় মাছের মাথার ঢুসে ও লেজের ঝাপ্টায় বিলক্ষণ শাস্তি পায়। "অমুক টোপ আমার নজরে পড়িয়াছে, উহা আমি ভোগ করিব, তোমরা ঠোকর দিয়া উচ্ছিষ্ট করিও না।" হুমড়া চুমড়া বড় মাছ যে ছোট মাছকে ইহা জানায়, এতে আর কোন সন্দেহ নাই। বড় লোকের অধীনস্থ সঙ্গীয় শিকারী সম্মুখে কোন হরিণ কি বাঘ পাইলে, যখন দেখে বড় লোক উহা গুলি করিতে প্রস্তুত, তখন সে নিজে গুলি চালাইতে বিরত থাকে। বড় মাছের সাক্ষাতে ছোট মাছের ব্যবহারও ঠিক সেইরূপ।

তুমি কি বল, মৎস্যের মনে কোন ভাব উদয় হয় না, উহারা একে অন্যে কোন মনোভাব ব্যক্ত করে না? মৎস্যে যে আপন ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারে, ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ করা যায়। মৎস্যের কার্য্যকলাপ সমিচীন ভাবে প্রণিধান করিলে, স্বতঃই প্রতীতি হইবে যে মৎস্যে অতি

বিচক্ষণতার সহিত বিবেচনা করিতে পারে। যখন কোন বড় মৎস্যী ডিম পাড়িতে যায়, ছোট মৎস্যগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। বড় মৎস্যী জলাশয়ের জলমগ্ন ধারে শক্ত মাটিতে একটী গর্ত্ত খোঁড়ে, ছোট মাছগুলি সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করিয়া থাকে। গর্ত্ত খোঁড়া হইলে, বড় মৎস্যী ডিম পাড়িতে বসে। উহার ডিম্বকোষ হইতে যে রস নিঃসৃত হইয়া জলে মিশিয়া আইসে, ছোট মাছগুলি অতি ব্যস্ত সমস্ততার সহিত তাহাই পান করিতে থাকে। বড় মৎস্যীর ভাব ভঙ্গিতে, আকার প্রকারে, ছোট মৎস্য সকলে কি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে নাই যে এইক্ষণে একটা ডিম পাড়ার কার্য্য হইবে এবং তাহাতে তাহাদের একটা বড় ভোজের আয়োজন হইবে? নহিলে কেন তাহারা এত আগ্রহের সহিত তাহার অনুবর্ত্তন করিবে? গর্ত্ত খুঁড়িতে দেখিয়া কি তাহাদের সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় নাই, নতুবা কেন তাহারা অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? হইতে পারে, তাহারা পূর্ব্বে উহা দেখিয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের ভোজ মিলিয়াছে। তাহা হইলে তাহাদের স্মৃতিশক্তি আছে, স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা পূর্ব্বপক্ষ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারে বলিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করা কি বুদ্ধির কার্য্য নহে?

যে বদ্ধ জলাশয়ে কৈ মৎস্য থাকে, সেখানে বড়শী ফেলিলে, টোপ দেখিয়া, অনেক কৈ মাছ দল বাঁধিয়া একত্রিত হয় এবং বড়শীতে অতি তাড়াতাড়ি একটীর পর অন্যটী ধরা পড়ে। কিন্তু যদি কোনক্রমে একটী বড়শীবিদ্ধ মৎস্য বড়শী ফস্‌কাইয়া, মাটি হইতে গড়াইয়া জলে পড়ে, সে এক দৌড়ে

গিয়া দলে মিশে, অন্য মাছ অতি চঞ্চল হইয়া তাহার দিকে চাওয়াচাহি করে এবং সকলে মিলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করে, আর সে দলের কোন মাছ বড়শীতে ধরে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, ঐ বড়শীমুক্ত মাছটী তাহার মহা বিপদের কথা দলস্থ সকলকে জানাইয়াছে, এ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যাহাই বল, এটি স্থির, মাছ বোকা নহে। মৎস্য শিকারী যদি সিদ্ধকাম হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার কারবার যে নিতান্ত বোকার সহিত নহে, এ ধারণা তাহার মনে দৃঢ় রাখিতে হইবে।

মৎস্যের মস্তিষ্ক, মধুসূদন অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তিষ্কের তুল্য ভারি না হউক, তবু আছেত। সেই মস্তিষ্ক তাহারা পরিচালন করিবে না, এ কথা কি যুক্তিসঙ্গত? তুমি এণ্ডির নালের মত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ সূত্র বড়শীতে যোজনা কর, কারণ কি? দড়িদড়া ব্যবহার করনা কেন? উহা ত শক্ত অথচ সস্তা। কারণ মৎস্যের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি আছে, সে উহা দেখিয়া চিন্তা করিবে,—সিদ্ধান্ত করিবে—ওটা একটা কিছু বিশেষ অমঙ্গলের চিহ্ন, তাই টোপটি সে স্পর্শও করিবে না। মৎস্য নির্ব্বোধ নহে। মৎস্যের সকল কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে এবং নিখিল বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিশ্চয়ই প্রতীত হইবে মৎস্যেরা পরস্পরে মনোভাব পরিব্যক্ত করে।

মানুষের মত পরিস্ফুট ভাষায় মৎস্যে কথা কহে, আমি এরূপ তর্ক করিতেছি না। তাহা না হউক, মৎস্যের একটা ভাষা আছে, উহা তুমি আমি না বুঝিলেও উহারা পরস্পরে

বুঝে। কিন্তু তাই বলিয়া, মৎস্যের শ্রবণশক্তি নাই, এ কথা বলিতে পার না। ডাক্তার লডার লিণ্ডসে বলেন—"বড় লোকের বাটীর পুকুরে যে নানা শ্রেণীর মৎস্য রক্ষিত ও পোষিত হয় এবং বাটীর কর্ত্তা স্বহস্তে উঁহাদিগকে আহার প্রদান করেন সেই সকল মাছ কর্ত্তার স্বর ও ডাক দূরের কথা, পদধ্বনি পর্য্যন্ত বুঝে। তাহারা একের ডাকে আইসে, অন্যের ডাকে নড়েও না।" ডাক্তর সাহেবের গবেষণাটা বড় বিস্ময়জনক নহে। আমাদের দেশে অনেক স্ত্রী পুরুষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এদেশে ঐরূপ সখের পুকুরে লোকে মাছের তামাসা দেখিতে যায় এবং খই মুড়ি খাবার দেয়; হাততালি দিলেই মাছগুলি জলে ভাসিয়া উঠে এবং নিকটে আইসে। পল্লিগ্রামে অনেকেই পুকুরের ঘাটে আচমন করে এবং মাছে খাওয়ার জন্য ভাত জলে ছুড়িয়া ফেলে, তাহাদের খড়মের শব্দ শুনিলেই মাছ নিকটে আসিয়া ভাসিয়া উঠে। মৎস্যের শ্রবণশক্তি অতি প্রবল, উহারা জলের নীচে থাকিয়া শব্দ শুনিতে পায়। মৎস্যের যে ঘ্রাণশক্তি আছে, ইহা বলা বাহুল্য। বড়শী শিকারীরা সুগন্ধ চার প্রস্তুত করিয়া বড়শীর চতুর্দ্দিকে জলে ছড়াইয়া নিক্ষেপ করেন, সেই স্থানে বড় মৎস্য সকল আসিয়া একত্রিত হয় এবং মুখে ভুড়্ভুড়ি ছাড়িতে থাকে, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। মৎস্য শিকারের কথা থাকুক্, মৎস্য ভোজনের সময় উপস্থিত, এইক্ষণে জনার্দ্দন "চিন্তয়েৎ"।

আহারান্তে অপরাহ্নে হস্তি আরোহণে বাড়ী আসিলাম। একে অ-বেলা গুরু ভোজন, তাহাতে হাতীর ঝুলনে বাড়ী পর্য্যন্ত আসা, শরীর বড় ভাল বোধ হইতে ছিল না। শরীর

আই-ঢাই করিতে লাগিল, শয্যায় পড়িয়া ছট ফট করিতে লাগিলাম ;—মনে পড়িল ;

"ভোগে রোগভয়ম্ কুলেচ্যুতি ভয়ম্
বৃত্তে নৃপালাদ্ ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ম্ বলে রিপুভয়ম্,
কায়ে কৃতান্তাৎ ভয়ম্ ॥
শাস্ত্রে বাদি ভয়ম্ গুণে খলভয়ম্,
রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতম্ ভুবি
নৃনাং বৈরাগ্য মেব ভয়ম্ ॥"

শঙ্করাচার্য্য।

বাড়ীতেই আছি, বর্ষাকাল, কোথাও যাওয়ার সুবিধা নাই। সকালে বন্দুক অভ্যাস, আর বাদ বাকী দিন কলম বাজি, এই নিয়াই আছি। আমার পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রস্তাব করিলেন। চল নৌকায় বেড়াইয়া আসি। তাহার প্রস্তাবানুসারে তখনই দিন ধার্য্য করিয়া, নৌকা স্থির করিতে লোক পাঠান হইল।

নিরূপিত দিনে নৌকায় যাইবার জন্য, আমরা বাটীর বাহির হইয়া অন্যতম এক জ্ঞাতির বাটীর সম্মুখে, জনৈক আত্মীয়ের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি ; এমন সময় দেখিতে পাইলাম, তাঁহার বাড়ীর "আঁস্টালে" জীর্ণ-শীর্ণা অতি মলিন বসন পরিহিতা একটী তের চৌদ্দ বছরের বালিকা ; ঐ আঁস্টাল হইতে পরিত্যজ্য কদন্ন অতি যত্নের সহিত নিজ গ্রন্থিযুক্ত বসনাঞ্চলে সঞ্চয় করিতেছে। দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা লাগিল ,—

"Famine is in thy cheeks,
Need and oppression starveth in thine eyes ;
Contempt and beggary hang upon thy back,
The world is not thy friend, nor the world's law.

Sh.

বেচারিকে কিছু দিয়া নৌকায় আরোহণ করিলাম। হায়, ভগবান, এ তোমার কি লীলা! কেহ সামান্য এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাঙ্গাল, কাহারও বা পঞ্চব্যঞ্জনে তৃপ্তি হয় না। কাহাকে তেতালায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায়, উপাদেয় ভোগ্য দ্বারা সুখ সচ্ছন্দে রাখিতেছ, আবার কাহাকে পর্ণশয্যায় গাছের তলে রাখিয়া কষ্ট দিতেছ! প্রভো যে শিশু না জন্মিতে মাতৃস্তনে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখ, শিশু উঠিতে পড়িতে দেহে ব্যথা না পায়, এই নিমিত্ত শরীর মাংসল করিয়া পাঠাও ; মরুভূমে পান্থ পাদপ সৃজন কর ;—মধুপুরের গড়েও দেখিয়াছি, কাঠুরিয়াদিগের তৃষ্ণা নিবারণ কল্পে "ভূতিয়া" * লতার সৃজন করিয়া রাখিয়াছ ; যে দিকে চাই সব দিকেই তোমার করুণার প্রস্রবণ উথলিয়া পড়িতেছে ; কিন্তু এ বালিকার অন্ন নাই কেন ? তোমার মহিমা, তুমিই জান!

যাইতে যাইতে, একটি বিলে যাইয়া পড়িলাম। ঘন বর্ষা জল থৈ থৈ করিতেছে, শস্যশ্যামলা প্রকৃতি দেবী শরদ সঞ্চারে আনন্দে নাচিতেছেন, স্থির সরসী জলে লোষ্ট্র

* মধুপুরের গড়ে ভূতিয়া লতা নামে এক প্রকার জলদ-লতা দেখা যায়, উহা এত দীর্ঘ হয়, যে, ৩।৪টা বড় বড় গাছ পর্য্যন্ত বেড়িয়া থাকে। উহার যে কোন স্থানে কাটিলেই এক গ্রাস পরিমাণ শীতল জল পাওয়া যায়। শ্রমজীবীরা ঐ জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

নিক্ষেপ করিলে যেমন তালে তালে বিচীমালা নাচিয়া উঠে, আমাদের তরণী সঞ্চালনে, শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র তেমনি দুই কাতারে, দুধারে নাচিতে লাগিল। দেখিয়া আমাদেরও প্রাণে অতুল আনন্দের উদ্রেক হইতে লাগিল। অনতিদূরে, বাতসঞ্চালিত রক্তাম্বরবৎ, এক পদ্মবন দৃষ্টিপথে পতিত হইল; হাঁস, কালেম প্রভৃতি জলচর পাখীরও শব্দ শুনা গেল। অমনি সেই দিকে নৌকা প্রধাবিত করিলাম। আমি বন্দুক লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। কালেম পাখী পাইলাম না। গুটিকত হাঁস মারিলাম। জ্ঞাতি বন্ধু শিকার দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন, এবং তিনি নিজ হাতেই পতিত পাখী গুলি কুড়াইয়া নৌকায় জড় করিতে লাগিলেন। আমি বন্দুকটি রাখিয়া দু-হাতে নৌকার দু' দিক হইতে কতকগুলি পদ্ম ফুল তুলিয়া লইলাম। প্রিয় পাঠক মণ্ডলি! আমার শিকারের শিক্ষানবিশী এই পর্য্যন্তই শেষ।